১ হাওয়া সাপ

হাওয়াসাপ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

শ্রীমতী চিত্রা দেব

কল্যাণীয়াসু

লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ত তৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কালো বাক্সের রহস্য
ম্যাকাসিকোর ছায়ামানুষ
বনের আসর
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
ভয়-ভুতুড়ে
কালো মানুষ নীল চোখ
হাট্টিম রহস্য
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
রহস্য রোমাঞ্চ
জনপদ জনপথ
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত

হাওয়া সাপ

হোটেল দা সী ভিউয়ের দোতলার ব্যালকনি থেকে বাতিঘরটা দেখা যায়। পাখিওড়া পথে দূরত্ব এক কিমি হতে পারে, আমার বাইনোকুলারের হিসেবে। তবে মানুষ পাখি নয়। জঙ্গল বালিয়াড়ি এবং পাথর ডিঙিয়ে সিধে পৌঁছুনো যদিও একটা অ্যাডভেঞ্চার, অন্তত আমি সেই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নই।

গভীর এবং ভয়াল একটা খাঁড়ির মাথায় ছোট্ট টিলার ওপর দাঁড়ানো পোড়ো ওই বাতিঘর কাদের কীর্তিস্তম্ভ পর্তুগীজ না মোগলদের, এ নিয়ে পণ্ডিতী তর্ক আছে। কিন্তু এটাই ছিল চন্দনপুরম অন-সীতে পর্যটন দফতরের দ্রষ্টব্যতালিকার এক নম্বরে।

মাসছয়েক আগে শোনা গেছে একটা বিপজ্জনক হাওয়ার কথা, 'স্নেকউইণ্ড।' কোনও কোনও রাতে সমুদ্র থেকে উঠে আসে নাকি সাংঘাতিক হাওয়া, যার আনুমানিক গড়ন বিশাল সাপের মতো, এবং এঁকেবেঁকে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে ঘুরপাক খেতে খেতে বাতি-ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। সিঁড়ি বেয়ে শীর্ষে উঠে ভাঙা জানালা-গুলোর কোনও একটা গলিয়ে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে ঝোড়ো প্রশ্বাসের মতো। তারপর ফুরিয়ে যায়, যদিও তার অন্তিম শ্বাসাঘাত ব্রেকারের পর ব্রেকারে কতক্ষণ ধরে সমুদ্রকে আলোড়িত করতে থাকে।

প্রাকৃতিক কোনও রহস্যময় ঘটনা গণ্য করা চলে, যেমন নাকি বার্মুডা ট্র্যাঙ্গল। কিন্তু নীচের খাঁড়িতে পর পর কয়েকটি থ্যাঁত-লানো দলাপাকানো লাস রহস্যটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। এগুলো নাকি সেই ঘাতক হাওয়ারই কীর্তিকলাপ, এবং এর বিস্ময়কর দিকটা হল, কেনই বা অত রাত্রে ওরা বাতিঘরে ঢুকেছিল। নীচের দরজার তালা প্রতিবারই ভাঙা ছিল। পাহারাদার থাকে খানিকটা দূরে তার সরকারি ঘরে। রাত দশটায় তালা এঁটে সে ফিরে যায়। যাওয়ার

তালাটা সে ছাড়া আর কে ভাঙবে? উল্টো ক্ষুর মতো পেঁচানো হাওয়াটা পাক খাইয়ে খাইয়ে জনেশ্বরজীকে ওপরে তোলে। তারপর জানালা গলিয়ে নীচের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আসলামের কী দোষ?

এখানকার সমুদ্রে সবখানেই অসংখ্য পাথর দেখেছি। বুনো হাতির পাল যেন সমুদ্রস্নানে নেমেছে। আমি দেখেছি, ব্রেকারগুলো কী মর্মান্তিক ধরনের ছেলেমানুষী করে। পাথরের পর পাথরে দাপাদাপি করতে করতে তীব্র গতিশীল হতে হতে গুঁড়ো গুঁড়ো ফেনিল আত্মবিনাশ! আঁশটে গন্ধটাও বিরক্তিকর। আর মাঝে মাঝে লক্ষকোটি শূন্য ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো অভ্যন্তরীণ গর্জন। এমন সমুদ্রে স্নান করা দুঃসাহসিকতা।

সব মিলিয়ে চন্দনপুরম উপকূল সৌন্দর্য এবং বিভীষিকার আশ্চর্য সমন্বয়। এখন সেপ্টেম্বরে পর্যটক বিরল। বিকেলে বাতিঘরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘন কালো মেঘ দেখে মনে হচ্ছিল তুমুল বৃষ্টি আসন্ন। বরং সামনে বিচের দিকটায় ঘুরে আসা যায়। পর্তুগীজ বা মোগলদের তৈরী পাথরের সারবন্দি গুদামঘর যত জরাজীর্ণ হোক, মাথা বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট। বিচ জনশূন্য। একটু পরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি এলে বিচের মাথায় একটা পাথরের ঘরে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, সামান্য দূরে বিচের ওপর প্রকাণ্ড পাথরে বসে এক যুবক আর যুবতী সামুদ্রিক বৃষ্টিকে সারা শরীর দিয়ে নিচ্ছে। ঈর্ষা হচ্ছিল। যৌবন প্রেমের জন্য কতকিছু করতে পারে। এ তো সামান্য।

দুপুরে ব্যালকনিতে বসে বাইনোকুলারে সম্ভবত এদেরই দেখেছিলাম। আমার এই বাইনোকুলারটি আমার বয়সকে নিয়ে কখনও-সখনও অশালীন রসিকতা করে। পরে মনে হয়েছিল, চুম্বনরত প্রেমিক প্রেমিকাকে কেন প্রয়োজন হয় অন্ধ প্রকৃতির? তা কি নিজের অর্থহীনতাকে অর্থপূর্ণ করে নিতে? সৌন্দর্যকে কিছুক্ষণের জন্য করতলগত করতে? অবশ্য প্রকৃতিতে অশ্লীল বলে কিছু নেই।

রদ্যাঁর ভাস্কর্য! তোমাদের ঠিকানা কোথায়?

সন্ধ্যায় বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। ব্যালকনিতে বসে সমুদ্রের শ্বাসপ্রশ্বাসে তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করছিলাম। অথবা আমার অনুভূতির ভুল। এ সময় এক পেয়ালা কড়া কফির প্রতীক্ষা ছিল। কিন্তু কুণ্ডনাথন কফি আনতে বড় বেশি দেরি করছে।

দক্ষিণপশ্চিমে বাতিঘরটা অন্ধকারে ডুবে আছে। সেদিকে একটা লাল স্ফুলিঙ্গ সদ্য নিভে গেল। চোখের ভুল নয়। নিশ্চয় কোনও প্লেন মেঘের ভেতর এইমাত্র ঢুকে গেল।

কিন্তু আবার সেই লাল স্ফুলিঙ্গ। বাইনোকুলার হাতের কাছে বেতের টেবিলে রাখা ছিল। দ্রুত চোখে রাখলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরে আলোটা আবার নিভে গেল। বাইনোকুলারের হিসেবে টর্চের মুখের সাইজ লাল আলো। কিন্তু আলোটা স্থির ছিল। রশ্মি বিকীরণও করছিল না।

কুণ্ডনাথনের সাড়া পেয়ে বললাম, 'এস। দরজা খোলা আছে।'

সে ব্যালকনিতে এসে টেবিলে ট্রে রাখল। বিনীতভাবে বলল, 'বাতি জ্বেলে দিই স্যার।'

'থাক। অন্ধকার আমার পছন্দ।' কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা কুণ্ডনাথন, তুমি কি কখনও রাতের দিকে বাতিঘরে লাল আলো জ্বলতে দেখেছ?'

এটা নেহাতই প্রশ্ন। আমার সিদ্ধান্তকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রশ্নটা শুনেই কুণ্ডনাথন ভীষণ চমকে উঠল। 'লাল আলো স্যার?'

হ্যাঁ লাল আলো। জ্বলে। আবার নিভে যায়।

সে গম্ভীর মুখে চাপা স্বরে বলল, 'দেখেছি স্যার! জ্ঞনেশ্বরজীর লাস যেদিন পাওয়া যায়, তার আগের রাতে এই ঘরে এক আমেরিকান সায়েব মেমসায়েব ছিলেন। ওদের কফি সার্ভ করতে এসে হঠাৎ চোখে পড়ল বাতিঘরের মাথায় যেন লাল আলো জ্বলছে। তার আগেও একবার দেখেছিলাম। তারপর সকালে একজন টুরিস্টের লাস পাওয়া গেল। কাকেও বলিনি স্যার! কিন্তু আপনি কি আলো দেখেছেন?'

লোকটি বুদ্ধিমান। গত শীতে এসে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলাম। ওর ফ্যামিলি থাকে কয়েক কিমি দূরে একটা গ্রামে। সেখানকার পাহাড়ী জঙ্গলে আমাকে কিছু অর্কিডের খোঁজ দিয়েছিল কুণ্ডনাথন।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে ভয় পাওয়া গলায় ফের বলল, 'দেখে থাকলে কাল সকালে আবার একটা লাস পাওয়া যাবে।'

একটু ঠাট্টার সুরে বললাম, 'আজ রাতে তা হলে সেই সাংঘাতিক শিসও শোনা যাবে। কী বলো কুণ্ডনাথন?'

'যাবে স্যার!' কুণ্ডনাথন জোর দিয়ে বলল, 'শিস দিতে দিতে হাওয়াটা আসবে।'

'তুমি শিসের শব্দ তো শোননি কখনও?'

'নাহ্। নিজে শুনিনি। অনেকে শুনেছে। শুনেছে বলেই তো কথাটা রটেছে।' সে তার কাঁধের তোয়ালেতে মুখের ঘাম মুছে বলল, 'আপনি কি সত্যিই আলো দেখেছেন স্যার?'

'দেখেছি।' কফিতে চুমুক দিয়ে একটু হেসে বললাম, 'তবে প্লেনের আলো হতে পারে।'

'আমিও তো স্যার প্লেনের আলো ভেবেছিলাম। কিন্তু পরদিন খাঁড়িতে লাস পাওয়া গেল। একবার নয়, দুবার। দুবারই খাঁড়িতে লাস।'

'আগের লাসটা শনাক্ত হয়েছিল জানো?'

'না স্যার। কোনও টুরিস্ট্ হবে।'

'টুরিস্ট্ হলে নিশ্চয় কোনও হোটেলে এসে ওঠার কথা।'

কুণ্ডনাথন আস্তে বলল, 'পুলিসের ঝামেলার ভয়ে হোটেল মালিকেরা চেপে যায়।

'কিন্তু রেজিস্টার চেক করলে তো—'

আমার কথার ওপর সে বলল, 'রেজিস্টারে চেকআউট দেখালেই হল।'

'কুণ্ডনাথন!' হাসতে হাসতে বললাম, 'সে তোমাদের হোটেলে ওঠেনি তো?'

তার মুখটা হঠাৎ কাতর হয়ে গেল। বছর পঞ্চাশ বয়স বেঁটে মোটাসোটা থলথলে গড়নের এই পরিচারকের তাগড়া কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। গোঁফটা কাঁপতে লাগল। কিছু গোপন কথা চেপে থাকতে বাধ্য হয়েছে, অথচ বলার জন্য মনে ছটফটানি আছে, এটা সেই সঙ্কটাপন্ন ভাব।

সাহস দেবার ভঙ্গিতে ফের বললাম, 'উঠেছিল?'

কুণ্ডনাথন বড়বড় চোখে তাকিয়ে থাকল। একটু পরে বলল, 'আমি তাকে যেন দেখেছিলাম।'

'তুমি তার নাম ঠিকানা, চেক-ইনের তারিখ এনে দিলে বখশিস পাবে কুণ্ডনাথন।'

মাথাটা একটু দুলিয়ে সে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলাম। সামুদ্রিক হাওয়া ব্যালকনিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলছে। সামনে সোজাসুজি তাকালে সমুদ্র ঝাউবনের আড়ালে পড়ে যায়। একটু বাঁদিকে ভাঙাচোরা পাথুরে একতলা মোগলাই বা পর্তুগীজ ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একখানে অনেকটা ফাঁকা। সেই ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। রাতের বিচে কোনও আলো নেই। আমার ধারণা বা ইচ্ছে হল, সেই প্রেমিক-প্রেমিকা বিচে বসে থাক অন্ধকারে। পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা সেখানে। আমি তাদের অবাধে খেলতে দিলাম।

আসলে নিজে বৃদ্ধ বলে যৌবনকে অনেক বেশি দাম দিয়ে থাকি।...

এই বে-মরসুমে চন্দনপুরম-অন-সীতে আমার ছুটে আসার পিছনে সুনির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য ছিল, যেটা এবার বলা দরকার। গতমাসের শেষাশেষি এখানে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের উদ্যোগে 'সমুদ্র-তরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি সেমিনার হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার। কাজেই ঝাঁকেঝাঁকে তথাকথিত

মিডিয়াম্যানদের আবির্ভাব স্বাভাবিকই ছিল। তাদের মধ্যে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের সংখ্যা কম ছিল না। সেমিনার শেষে সবাই যে-যার ঠিকানায় ফিরে যায়। ফেরেনি শুধু একজন। সুমিত্র গুহরায়। ছাব্বিশ বছর বয়স। রোগা, ফর্সা, উচ্চতা আন্দাজ পাঁচফুট তিনইঞ্চি। কয়েকটা ইংরেজি বাংলা হিন্দি পত্রিকায় পুলিসের মিসিং স্কোয়াডের পক্ষ থেকে ছবি ছাপানো হয়েছিল। টিভিতেও ছবিটি দেখেছি। কিন্তু এ যাবৎ খোঁজ মেলেনি। চন্দনপুরম পুলিসও হদিস দিতে পারেনি। অথচ এখানে এসে শুনছি, বাতিঘরের খাঁড়িতে পাঁচটা লাসের খবর!

আশ্চর্য ব্যাপার, স্থানীয় পুলিস কিংবা চন্দনপুরম ডেভালাপমেন্ট অথরিটি (সি ডি এ) এ নিয়ে মাথা ঘামাননি সেটা বোঝা যায়, সেই খবর কাগজে বেরোয়নি। এখানে পৌঁছুনোর পর কুণ্ডনাথনের মুখে আমি খবরটা পেয়েছি। সী ভিউ হোটেলের ম্যানেজার গোপাল-কৃষ্ণনের বক্তব্য, খবর চেপে রাখার পিছনে পর্যটন দফতরের হাত আছে। 'পর্যটন অর্থনীতি' ঘা খাবে!

'পর্যটন-অর্থনীতি!' আজকাল শব্দ জুড়ে জুড়ে অদ্ভুত সব টার্ম চালু করা আমলাতন্ত্রের আরামকেদারাবিলাস। নিছক বিলাস বলা ভুল হবে। এর পিছনে অর্থনীতি (!) আছে। কমিশনভোগী দালাল রাজনীতিওয়ালা, কন্ট্রাক্টার আর আমলাতন্ত্রের একটা দুষ্টচক্র অধুনা দেশজুড়ে লুঠ চালাচ্ছে।

তো সুমিত্র গুহরায় ফোটোফিচারিস্ট হিসেবে বেশ নাম করেছিল। কলকাতার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় তার কিছু সচিত্র ফিচার আমি পড়েছিলাম, যেগুলি প্রায় অ্যাডভেঞ্চারারের মানসিকতার লক্ষণ এবং প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তথ্যসংগ্রহ। এ থেকে সুমিত্র সম্পর্কে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাই সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক আমার বিশেষ প্রীতিভাজন জয়ন্ত চৌধুরী তার নিখোঁজ বন্ধু সম্পর্কে আমাকে অনুরোধ করামাত্র রাজি হয়েছিলাম। জয়ন্তকে সঙ্গে নিইনি সতর্কতার

করুন। তাছাড়া তার স্বভাবে হঠকারিতার ঝোঁক আছে।

সকালে এখানে পৌঁছুনোর পর থানা এবং 'সি ডি এ' অফিসে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, সেটা হঠকারিতাই হবে। এ ধরনের কেসে তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। আজকাল বোঝাই যায় না, কোথায় কোন স্বার্থ ওঁত পেতে আছে। এক বৃদ্ধ রিটায়ার্ড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কেনই বা খাঁড়ির লাস বা 'সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন'-সংক্রান্ত সেমিনার নিয়ে খোঁজখবর করতে এসেছেন? একটা স্বাভাবিক সন্দেহের উদ্রেক হবে এবং আমার পথ নিরঙ্কুশ হবে না।

সী ভিউয়ের ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণন অবশ্য গত ডিসেম্বরেই আমাকে বাতিকগ্রস্ত সাব্যস্ত করেছিলেন। এটাই আমার বাড়তি সুবিধা। 'সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন' ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। শুনেছি, বাতিঘরের নিচের খাঁড়িতেই একটা প্রজেক্ট হবে। 'সাইট সিলেকশন' হয়ে গেছে নাকি। গোপালকৃষ্ণন বিষয়টি বোঝেন। খাঁড়িতে একটা কংক্রিটের ঘর তৈরি হবে, যার একদিকে তলার অংশ খোলা থাকবে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তীব্রবেগে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে একটা টারবাইনকে ধাক্কা দেবে ক্রমাগত। টারবাইন ঘুরবে। ঘরের মাথায় থাকবে জেনারেটর। গোপালকৃষ্ণনের মতে, 'কস্টলি প্রডাকশন। মিসইউজ়া লাট্টা অব মানি অ্যাণ্ডা লেবার।'

'বাতিঘরে সাংঘাতিক হাওয়ার উপদ্রব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'হাঃ হাঃ! দ্যাট্টা স্নেক-উইণ্ডা?'

'নিছক গুজব?'

'জানি না। তবে বাতিঘরটা নিয়ে আগেও অনেক ভুতুড়ে গল্প শুনেছি। এবারকারটা নতুন। তবে—'

'বলুন!'

'এখানে সমুদ্র খুব আদিম। সভ্যভব্য নয়। শুধু টুরিস্টরা নয়,

আমরা সবাই সভ্যভব্য সমুদ্র দেখতে ভালবাসি। যে সমুদ্রে স্নান করা যায়, হুল্লোড় করা যায়। নেড়েচেড়ে দেখা যায়, স্বাদ নেওয়া যায় এমন সমুদ্রই মানুষের প্রিয়। এখানকার সমুদ্রকে আকর্ষণীয় বলা চলে না কর্নেল সরকার। এখানকার একমাত্র আকর্ষণ ওই বাতিঘর। উঁচুতে উঠে অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্রের চেহারা দেখার সুযোগ দেয় বাতিঘরটা। পূর্ব উপকূলে আর কোথায় আপনি সমুদ্রের অতটা বিশালতা দেখতে পাবেন, চিন্তা করুন।'

'শুনলাম, বাতিঘর সম্প্রতি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'হাঃ হাঃ! জনেশ্বরজীর আত্মার সম্মানে। সেমিনারের জন্য উনি তিন লাখ টাকা দান করেছিলেন। চক্ষুলজ্জা কর্নেল সরকার! প্রজেক্টের কন্ট্র্যাক্ট, জনেশ্বরজীই পেতেন, আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

সম্ভবত গোপালকৃষ্ণন সেই ধরনের লোক, যাঁরা সব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে চান। তবে বুঝতে পেরেছি 'স্নেকউইণ্ড' অর্থাৎ কি না ঘাতক সামুদ্রিক সর্পিল হাওয়া সম্পর্কে উনি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পারেননি এখনও। আবার এ-ও বুঝেছি, বাতিঘরটা নিয়ে বরাবর ভূতুড়ে গুজব ছিল···।

রাত নটায় নিচের ডাইনিং হলে ডিনার খেতে গেলাম।

ডাইনিং হলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঁচজন ডিনার-প্রত্যাশী বসেছিলেন। এক প্রৌঢ় দম্পতি—সম্ভবত গোয়ানিজ, একজন বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা মধ্যবয়সী—সম্ভবত তামিল, একজন রাগী চেহারার যুবক—সম্ভবত বাঙালী এবং একজন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়। এরা সবাই বোর্ডার কি না জানি না। কারণ এখানে রুচির কারণে বাইরের লোকেরাও মহার্ঘ খাদ্য খেতে আসে। লাঞ্চের সময় ডাইনিং হলে আমি একা ছিলাম। কারণ ততক্ষণে লাঞ্চপর্ব শেষ। আমার ফিরতে দেরি

হয়েছিল এবং তখন প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল।

কোনার দিকে জানালার পাশের টেবিলে বসলাম। পিছনের দরজায় ঝোলানো পর্দার ফাঁকে রিসেপশন এবং লাউঞ্জের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। রিসেপশন কাউন্টারে মোটামুটি সুন্দরী অ্যাংলো যুবতী (ডিসেম্বরে একে দেখিনি) হেসে হেসে কথা বলছিল কারও সঙ্গে। একটু ঘুরে দেখে নিলাম কাউন্টারের টেবিলে বাঁহাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে ঝুঁকে আছেন ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণন। লাউঞ্জে সোফায় বসে পত্রিকা পড়ছেন এক ভদ্রলোক। পরনে টাইস্যুট। কোনও কোম্পানি এক্সিকিউটিভ না হয়ে যান না।

কুণ্ডনাথন এগিয়ে এল আমাকে দেখে। 'আপনার ডিনার ওপরে পাঠিয়ে দিতাম স্যার!'

আস্তে বললাম, 'এঁরা সবাই কি বোর্ডার?'

'হ্যাঁ স্যার। আজকাল রাতে এতদূরে কেউ ডিনার খেতে আসে না।'

'স্নেকউইংগের ভয়ে নাকি?'

কুণ্ডনাথন হাসল না। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বলল, 'সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোক দেখা যায় না।'

এই সময় যে রাগী চেহারার যুবকটিকে বাঙালী ভেবেছিলাম, সে দক্ষিণী ভাষায় কুণ্ডনাথনের উদ্দেশে কিছু বলল। কুণ্ডনাথন তার কাছে চলে গেল। মনে মনে হাসলাম! তা হলে সত্যিই দেখা এবং জানা এক জিনিস নয়। অথচ আমার সম্পর্কে চালু গুজব, আমি নাকি অন্তর্যামীর প্রায় একটি পার্থিব সংস্করণ এবং আমার দৃষ্টি নাকি গামা রশ্মির মতো ইস্পাতের প্রাচীরভেদী!

খাওয়া শেষ করেছি, এমন সময় আমার বুক কাঁপিয়ে বিচে দেখা সেই প্রেমিক-প্রেমিকার আবির্ভাব। দুটো টেবিলের ওধারে ওরা মুখোমুখি বসল। এমন চঞ্চল হাসিখুশি যৌবন এদেশে কদাচিৎ দেখেছি। ওরা বাংলায় কথা বলছিল চাপা স্বরে। এ ও আমার বিহ্বলতার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওরা কি স্নেকউইংগু সম্পর্কে

কিছু শোনেনি? সাবলীল সৌন্দর্যের সঙ্গে ঈষৎ কুণ্ঠার পরিশীলিত মিশ্রণ আমাদের প্রাচ্য যৌবনের নাকি সাধারণ লক্ষণ। সেই মিশ্রণ দেখছি না। বেপরোয়া উদ্দামতা চন্দনপুরমের বন্য আদিম সমুদ্রের কাছেই কি ওরা সংগ্রহ করেছে? কিন্তু হনিমুন করতে চন্দনপুরমকে বেছে নিল কেন, যে সমুদ্রে স্নান করা প্রায় অসম্ভব? মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না কম আলোর জন্য দেখা যাচ্ছিল না। ন্যাপকিনে হাত মুছে চুরুট ধরালাম। কুণ্ডনাথন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কফি ঘরে পৌঁছে দেবে, না কি এখানে বসেই খাব।

কুণ্ডনাথন ভাঙাচোরা ইংরেজি বলে। সঠিক শব্দটি খুঁজে না পেলে হিন্দি বসিয়ে দেয়। ওর প্রশ্নের জবাবে ইচ্ছে করেই বাংলায় বললাম. 'ওপরে পাঠিয়ে দিও।'

'স্যার?'

এবার ইংরেজিতে বললাম। কুণ্ডনাথন সরে গেল। কিন্তু আমার তীর লক্ষ্যভেদ করেছিল। ওরা দুজনেই ঘুরে আমার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময় ছিল। অনেকে আমাকে বিদেশী কিংবা কোনও সময়ে পাদ্রিবাবা বলে ভুল করে। বিদেশী পাদ্রিরা আবার চমৎকার বাংলাও বলেন। কিন্তু ওদের বিস্ময় সে ধরনের নয়। হকচকিয়ে ওঠার মতো।

যুবকটি দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কিন্তু তার হাবভাবে আর সেই স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছিলাম না। যুবতীটি মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমাকে দেখে নিচ্ছিল। কাজেই সিদ্ধান্ত করলাম, হনিমুন নয়। অর্থাৎ ওরা দম্পতি নয়, খাঁটি প্রেমিক-প্রেমিকা। সিঁদুর এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। কিন্তু চন্দনপুরম বেছে নিল কেন ওরা?

আমি উঠে দাঁড়াতেই যুবকটি আমার দিকে তাকাল। এই সুযোগটা নিলাম। 'কলকাতা থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় উঠেছেন?'

'কাছেই।'

একটু হেসে বললাম, 'এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও হোটেল নেই। কাজেই নিশ্চয় কাছাকাছি নয়।'

'সো হোয়াট ?'

এই ফুঁসে ওঠা আশা করিনি। দেখা এবং জানায় সত্যিই দুস্তর ফারাক। ছোটখাটো অট্টহাসি হেসে বললাম, 'শুভ মধুচন্দ্রিমা।' তারপর পিছু না ফিরে লাউঞ্জে গিয়ে ঢুকলাম।

গোপালকৃষ্ণন নেই। সম্ভবত নিজের ঘরে গেছেন। রিসেপসনিস্ট মেয়েটি 'হাই' করল। তার সম্ভাষণে সাড়া দিয়ে সোফায় বসে পত্রিকাপড়া ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার ঘড়ি দেখলেন। কারও প্রতীক্ষা করছেন হয়তো। হাট করে খোলা বড় দরজার বাইরে পোর্টিকোর নিচে একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

কার্পেটমোড়া সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ফিরলাম। দরজা খোলাই রইল। ডিনারের পর এক পেয়ালা কফি আমার চাই-ই। ব্যালকনিতে বসে অন্ধকারে বাতিঘরটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে থাকলাম। আবার সেই লাল আলো, ঘাতক হাওয়া এবং খাঁড়িতে লাস পড়ার সম্ভাবনা আমার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে কুণ্ডনাথনের সাড়া এল। সে জানে, তার জন্য দরজা খুলে রাখি। কিন্তু লোকটি অতিশয় ভদ্র। ক্রিশ্চান মিশনারী স্কুলে কবছর পড়েছিল। বিলিতী আদবকায়দা জানে।

টেবিলে কফি রেখে সে উর্দির পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ দিল। আস্তে বলল, 'মেরী রিসেপসনে নতুন এসেছে। তারিখটা আমার মনে ছিল। ২৭ আগস্ট। সন্ধ্যা ৬টায় চেকইন করেছিল। মেরীকে বলামাত্র রেজিস্টার দেখে লিখে দিল। ওকে বলেছি আপনার দরকার আছে।'

কাগজটা খুলে নিরাশ হয়েছিলাম। সুমিত্র গুহরায় নয়। এ কে দাশগুপ্ত এবং ঠিকানা কলকাতারই। বললাম, 'তুমি লাসটা দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমিই দেখে এসে বললাম ম্যানেজারসায়েবকে। উনি বললেন, চেপে যাও। সকাল ছটায় চেক আউট দেখিয়ে দিলেন রেজিস্টারে। সাড়ে ৬টায় একটা বাস ছাড়ে। চন্দনপুরম স্টেশনে নটায় কলকাতার ট্রেন। পাকা হিসেব।'

'চেহারা মনে পড়ছে?'

'রোগা মতো।'

'গায়ের রঙ?'

'ফর্সা।'

'সঙ্গে ক্যামেরা ছিল?'

'ছিল। একটা স্যুটকেসও ছিল।'

উত্তেজনা চাপতে চুপচাপ কফিতে চুমুক দিলাম। সুমিত্র হোটেল দা শার্কে উঠেছিল ২২ আগস্ট সকাল নটায়। সেখান থেকে চেক আউট করে ২৭ আগস্ট বিকেল তিনটেয়। চন্দনপুরম স্টেশনে আপ মাদ্রাজ মেল পৌছয় সন্ধ্যা ছটায়। কাজেই পুলিশের তদন্তে কোনও গণ্ডগোল নেই। বিশেষ করে তার ফেরার টিকিট ছিল ওই ট্রেনেরই। রেলে তদন্ত করে পুলিশ জেনেছে সুমিত্র গুহরায় নির্দিষ্ট বগির নির্দিষ্ট বার্থেই ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে:

১। কোনও কারণে সে ওই ট্রেনে কলকাতা যায়নি।

২। তার টিকিটে অন্য কেউ গিয়েছিল। টিকিট কি সে কাকেও বেচে দিয়েছিল? নাকি তার টিকিট চুরি করা হয়েছিল?

৩। সে কোনও কারণে নাম বদলে সী ভিউয়ে উঠেছিল এবং সকালে তার থ্যাঁতলানো লাস খাঁড়িতে পাওয়া যায়। শনাক্ত করার মতো কোনও জিনিস লাসের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু শুধু কুগুনাথন তাকে চিনতে পেরেছিল।

পয়েন্টগুলো মাথায় রেখে বললাম, 'তুমি সকালে খাঁড়িতে কেন গিয়েছিলে কুগুনাথন?'

সে ভড়কে গিয়ে বলল, 'অনেকে গিয়েছিল স্যার!'

তার চোখে চোখ রেখে বললাম, 'তুমি কি তাকে রাত্রে হোটেল থেকে বেরোতে দেখেছিলে ?'

'ডিনার খেয়েই উনি বেরিয়ে যান।'

'কিছু বলে গিয়েছিল তোমাকে বা অন্য কাউকে ?'

'না স্যার। হোটেল তো চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। আমরা শিফট ডিউটি করি।'

'ওর ক্যামেরা, স্যুটকেস বা অন্য জিনিসপত্র কী হল ?'

কুণ্ডনাথন বিব্রতভাবে তাকাল। করজোড়ে বলল, 'আমি সামান্য টাকার চাকরি করি স্যার। কোনও বিপদ হলে আমার পরিবার সমুদ্রে ভেসে যাবে।'

'তোমার কোনও ক্ষতি হয়, এমন কিছু করব না কুণ্ডনাথন! আমাকে আশা করি তুমি ভালো জানো। তুমি বুদ্ধিমান কুণ্ডনাথন! তোমার ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই শুধু খানিকটা সাহস। আর দেখ, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো!'

এবার কুণ্ডনাথন এদিকওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সব ম্যানেজারসায়েব নিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো নষ্ট করে ফেলেছেন।'

কথাটা বলেই সে চলে গেল। উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘরে শুধু টেবিলবাতিটা জ্বালিয়ে রেখে ব্যালকনিতে এসে বসলাম। ওপরে তিনটে স্যুইট এবং তিনটে ব্যালকনি। আমারটা পূর্বমুখী, অন্য দুটো দক্ষিণমুখী। তাই দেখা যায় না। তা ছাড়া আমার এই স্যুইটের পরই সিঁড়ি। অন্য দুটি স্যুইট সিঁড়ির উল্টো দিকে। একটা করিডর হয়ে পৌঁছুতে হয় সে-দুটিতে।

তাহলে নিখোঁজ সুমিত্র গুহরায়ের খোঁজ পাওয়া গেল। এর পরের ধাপ গোপালকৃষ্ণনের কাছে পৌঁছানো। লোকটা তো আপাতদৃষ্টে অতিশয় ভদ্র। যুক্তিবাদীও বটে। কিন্তু সুমিত্রের ব্যাপারে নিছক পুলিশের ঝামেলা এড়াতেই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া এবং তার জিনিসপত্র গাপ করা সঙ্গত মনে হচ্ছে না। ঝামেলাটা

কী আর হত? একজন বোর্ডার বেঘোরে মারা পড়তেই পারে। কোনও হোটেল নিজস্ব এলাকার বাইরে বোর্ডারের কিছু ঘটলে তার জন্য দায়ী হতে পারে না। আইনতই পারে না।

কাজেই গোপালকৃষ্ণনের আচরণ খুবই সন্দেহজনক।

কিন্তু আগ বাড়িয়ে তাকে চার্জ করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। একটা ব্যাপার স্পষ্ট। রিসেপসনিস্ট মেরীর সঙ্গে কুণ্ডনাথনের বোঝাপড়া আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে মেরীর হেসে হেসে কথাবার্তা বলা অবশ্য দেখেছি। সেটা চাকরির স্বার্থেই বলা যায়। কুণ্ডনাথনের সঙ্গে মেরীর বোঝাপড়া না থাকলে নাম ঠিকানাটা আমি পেতাম না। কিন্তু নাম ঠিকানার বদলে কুণ্ডনাথনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই তো সুমিত্রকে আবিস্কার করতে পারতাম।

একটু ভুল করে ফেলেছি। মেরীর সঙ্গে কুণ্ডনাথনের বোঝাপড়া থাক বা না-ই থাক, মেরীকে আমার তদন্তের সুতোয় জড়িয়ে ফেলেছি। এর কোনও দরকারই ছিল না।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলাম। নাহ্! হয়তো ঠিক করেছি। গোপালকৃষ্ণনের কানে ব্যাপারটা দৈবাৎ গেলে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে। সে নিজে থেকেই আমার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চাইবে। দেখা যাক।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। উঠে গিয়ে পশ্চিমে'র জানালায় উঁকি দিলাম। পোর্টিকো থেকে সেই গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। গেট পেরিয়েই চন্দনপুরমের দিকে চলে গেল খুবই জোরে।...

ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছিল। টেবিলবাতি জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। বারোটা কুড়ি। বললাম 'কে?'

'আমি কুণ্ডনাথন স্যার!'

'কী ব্যাপার কুণ্ডনাথন?'

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত স্যার। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার জন্য আপনার ঘুম ভাঙাতে হল।'

কোথায় কোন ক্রুর স্বার্থ ওঁত পেতে আছে ভেবে আগে রিভলভারটা হাতে নিলাম। তারপর ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। আই হোলে চোখ রেখে দেখি, কাঁচুমাচু মুখে কুণ্ডনাথন দাঁড়িয়ে আছে এবং তার পেছনে সেই 'প্রেমিকা'।

তবু ফাঁদের কথা মাথায় রেখেই দরজা খুলে সরে এলাম। আমার হাতে রিভলভার দেখে কুণ্ডনাথন হকচকিয়ে গেল। 'স্যার! এই ভদ্রমহিলা আপনার সাহায্য চান।'

'কী সাহায্য?'

'ভদ্রমহিলা' ঘরে ঢুকে আমার পা ছুঁতে ঝুঁকল। 'আপনি আমার বাবার মতো। আমাকে বাঁচান। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।' সে কান্না ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছিল। 'আমাকে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে ও চলে গেল। এখনও ফিরছে না। আমার ভয় করছে। আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন! তাই একে বললাম আপনাব কাছে নিয়ে যেতে।'

'বসো। আগে শান্তভাবে বসো।'

ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। কুণ্ডনাথনকে বললাম, 'ম্যানেজারসায়েব কি বাড়ি চলে গেছেন?'

সে বলল, 'রাত সাড়ে দশটায় গুপ্টাসায়েবের গাড়িতে চলে গেছেন।'

'কে গুপ্টাসায়েব?'

'মাদ্রাজে থাকেন। জনেশ্বরজীর কারবারের পার্টনার। মাঝেমাঝে আসেন এই হোটেলে। ম্যানেজারসায়েবের সঙ্গে বন্ধুত্য আছে।'

'গাড়িতে আর কে গেল দেখেছ?'

তাঁকে চিনি না। চুস্ত পাঞ্জাবি পরে এসেছিলেন। উনি এলে ওঁর সঙ্গে গুপ্টাসায়েব আর ম্যানেজারসায়েব বেরিয়ে গেলেন।'

'ঠিক আছে। তুমি এস। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

পালিয়ে বাঁচার ভঙ্গিতে কুণ্ডনাথন সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। আমার হাতে রিভলভার দেখার আশা করেনি সে। আমিও অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। কিন্তু যে-কোনও অবস্থার জন্য তৈরি থাকা ভাল। এ একটা ফাঁদ হতেও পারত।

দরজা বন্ধ করে যুবতীর মুখের দিকে তাকালাম। প্রেমিকার সৌন্দর্য ছত্রখান। আমার চোখ কবির নয় যে বিষাদময়ী প্রতিমার সৌন্দর্য দেখতে পাব। তা ছাড়া ওই মুখে বিষাদ নয়, উদ্বেগ আর আতঙ্ক নখের আঁচড় কেটেছে। বললাম, 'কী নাম তোমার?'

'দীপা।'

'দীপা—কী?'

'দীপা মিত্র।'

'তোমার সঙ্গীর নাম কী?'

দীপার ঠোঁট কেঁপে উঠল। একটু ইতস্তত করে ভাঙা গলায় বলল, 'অমল···দাশগুপ্ত।'

'এক মিনিট।' বলে টেবিলে রাখা কিটব্যাগের চেন টেনে কুণ্ডনাথনের দেওয়া কাগজটা বের করলাম। ওর সামনে খুলে বললাম, 'দেখ তো, চেনা মনে হয় নাকি?'

দীপা নাম ঠিকানাটা পড়ে দেখেই চমকে উঠল। 'এ তো অমলেরই নাম ঠিকানা!'

'বাই এনি চান্স তুমি সুমিত্র গুহ রায় নামে কাকেও চেনো?'

'চিনতাম।' দীপা নড়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'অমলের বন্ধু ছিল। আমার কয়েকটা ছবি তুলে দিয়েছিল। কাগজে তার ছবি দেখেছিলাম। তার কী হয়েছিল, অমল জানে। এখান থেকে অমলকে সুমিত্র একটা চিঠি লিখেছিল।'

'কী লিখেছিল?'

'আমি পড়িনি। অমল বলছিল, সুমিত্রকে নাকি কারা ফাঁদে ফেলে মার্ডার করেছে।'

'তোমরা এখানে কবে এসেছ?'

'গতকাল সকালে।'

'কোথায় উঠেছ?'

'অমলের এক ম্যাড্রাসি বন্ধুর একটা কটেজ আছে, সেখানে।'

'অমল বলেনি কেন এখানে আসছে?'

'জায়গাটা নাকি দেখার মতো। খুব নির্জন বিচ।' দীপা রুমালে চোখ মুছে আস্তে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে অমল আব বেঁচে নেই। হয়তো সুমিত্রের মতো তাকেও কারা ট্র্যাপ করেছে। কর্নেলসায়েব! আপনি একটা কিছু করুন।'

'আমাকে তুমি চেনো।'

'চিনতাম না। হোটেলের বেয়ারা, ভদ্রলোক বলল, আপনার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'তুমি লাউঞ্জ থেকে থানায় ফোন করলে না কেন?'

'দীপা মুখ নামিয়ে বলল, আমরা লিগ্যালি স্বামী-স্ত্রী নই। পুলিশ যদি—'

'বুঝেছি।' উত্তেজনা এলে চুরুট তা প্রশমিত করে। চুরুট ধরিয়ে বললাম, 'অমল কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি?'

'কিচ্ছু না। বলে গেল, ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরবে।'

'কোথায় যাচ্ছে তুমি জানতে ইনসিস্ট, করোনি কেন?'

'আমার মাথায় আসেনি। ভাবলাম পত্রিকা পড়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেব।'

'তুমি কী কর?'

'একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে স্টেনোটাইপিস্ট।'

'বাড়িতে কে-কে আছেন?'

'বাবা বেঁচে নেই। মা আমার কাছে থাকে। দাদা রাঁচিতে থাকে। দীপা আবার ছটফটিয়ে বলল, 'কর্নেলসায়েব! আপনি একটু খোঁজ নিন প্লিজ! আমাকে কেন যেন মনে হচ্ছে, ওর কোনও বিপদ হয়েছে।'

'এখানে আসার পর অমলের সঙ্গে কাকেও মিট করতে দেখেছ?'

'নাহ্। এখানে কারও সঙ্গে ওর চেনাজানা আছে বলে মনে হয়নি। ওর ম্যাড্রাসি বন্ধু তো কলকাতায় থাকে। তার কাছে কটেজের চাবি নিয়ে এসেছি আমরা।'

'অমল কী করে?'

'একটা অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি করে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তুমি নিচে লাউঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি যাচ্ছি। একটা কথা। কেউ বাইরে যেতে ডাকলে যাবে না। এমনকি কুণ্ডনাথন ডাকলেও না। দু মিনিটের মধ্যে আমি যাচ্ছি।'

দীপা বেরিয়ে গেলে পোশাক বদলে নিলাম। রেনকোট, টুপি চড়িয়ে এবং অস্ত্রটি বুকের কাছে সহজ আয়ত্তে রেখে বের হলাম। দরজা লক করে আস্তেসুস্থে নেমে গেলাম। লাউঞ্জে দীপা দাঁড়িয়ে ছিল। রিসেপশনে মেরীর বদলে এখন আরুলান্থান। কুণ্ডনাথনকে দেখতে পেলাম না। আরুলান্থান সম্ভাষণ করে বলল, 'খারাপ কিছু কি ঘটেছে স্যার? পুলিশকে জানিয়ে দিন না।'

স্মার্ট ছোকরা আরুলান্থানকে মার্কিন ব্ল্যাক বলে ভুল হতে পারে। গলায় সোনার চেনে ক্রস ঝুলছে। গায়ে লাল গেঞ্জি, পরনে ব্যাগি প্যান্ট, ঝাঁকড়মাকড় কোঁকড়া চুল। ওকে বললাম, 'খারাপ কিছু ঘটার কথা ভাবছ কেন তুমি?'

'মেরী বলছিল এই মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়েছেন।' সে চোখ নাচিয়ে বলল, 'অ্যাণ্ড য়ু নো দা স্নেকউইণ্ড স্যার!' আরুলান্থানের মুখে সবসময় হাসি মেখে থাকে। কাউন্টারে যেন দাঁড়িয়ে নেই, নাচছে।

দীপাকে বললাম, 'চলো! আগে তোমাকে কটেজে পৌঁছে দিই। তোমাদের কটেজটা একবার দেখা দরকার।'

যেতে যেতে দীপা বলল, 'কটেজে অমল যায়নি। গেলে একা কেন যাবে?'

কোনও কথা বললাম না। নির্জন রাস্তায় দূরে দূরে দাঁড়ানো

ল্যাম্পপোস্ট থেকে নিষ্প্রভ আলো ছড়াচ্ছে। দুধারে বসতি নেই। টিলা, বালিয়াড়ি, কেয়াঝোপ আর বড় বড় পাথরের চাঁই ঘেষে ঘন উঁচু নিচু, জঙ্গল। সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে গেল। সেদিকটায় বসতি। ডানদিকে খোয়া-ঢাকা সংকীর্ণ রাস্তা গেছে সমুদ্রের সমান্তরালে। বাঁকের মুখে দীপা বলল, 'এই দিকে।'

খোয়াঢাকা রাস্তাটা উৎরাই। নিচু টিলার ঢেউখেলানো বিস্তার। কোথাও নগ্ন, কোথাও জঙ্গলে ঢাকা। ছোট-ছোট বাংলোবাড়ি এখানে-ওখানে এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে। একখানে দীপা ডাইনে ঘুরল। সামনে কাঠের বেড়া এবং গেট। গেটের আগড় সরিয়ে টালিঢাকা ছোট্ট বাংলোর সামনে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের শব্দ কানে এল এতক্ষণে। বারান্দায় কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছিল। দীপা দরজার তালা খুলে দিল। দেখলাম ভেতরেও আলো জ্বালানো আছে। দীপা একটা জানালা খুলে বলল, এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়।'

এ অবস্থায় তার মুখে সমুদ্রের সংবাদ অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু আমার তত্ত্ব অনুসারে যৌবনের উপাদানগুলি এরকমই হয়। নিজস্ব ধর্ম মেনে চলে। দীপা বলল, 'এটা বসার ঘর। ওটা বেডরুম। ওদিকে কিচেন আছে। আমরা অবশ্য রান্না করিনি।'

বেডরুমটাও ছোট। ডাবলবেড একটা খাট, দেওয়ালে ঝোলানো ডিমালো আয়না, তার নিচে একটা ছোট্ট টেবিলে কিছু প্রসাধন-সামগ্রী। কোণার দিকে একটা ওয়ার্ডরোব।

দীপা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়েছিল। বললাম, হাতে সময় কম। তোমরা সঙ্গে নিশ্চয় স্যুটকেস এনেছ?'

'স্যুটকেস আর ওই কিটব্যাগটা।'

,স্যুটকেসের চাবি তোমার কাছে আছে?'

দীপা চোখে প্রশ্ন রেখে বলল, 'আছে।'

ততক্ষণে বিছানার কোণায় পড়ে থাকা কিটব্যাগটা আমি খুলেছি।

ময়লা জামাকাপড় ছাড়া কিছু নেই। দুদিকের চেন খুলে শূন্য দেখলাম।

'আপনি কী খুঁজছেন?'

'এবার তোমার হ্যাণ্ডব্যাগটা দেখতে চাই।'

দীপা কথা না বলে তার কালো হ্যাণ্ডব্যাগটা দিল। তিনটে একশো টাকার নোট, কয়েকটা দশ, পাঁচ, দুই, এক টাকার নোট এবং খুচরো পয়সা দেখতে পেলাম দুদিকের দুটো খোপে। মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগে অনেকগুলো খোপ থাকে কেন, আমার কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য। দুটো রেলের টিকিট বেরুল। জার্নির তারিখ আগামীকাল সকালের ট্রেনের। বললাম, 'তোমাদের সকালে কলকাতা ফেরার কথা তা হলে?'

দীপা চোখে প্রশ্ন এবং বিস্ময় রেখে বলল, 'হুঁ। কিন্তু আপনি কী খুঁজছেন?'

'জানি না। স্যুটকেসটা খোলো।'

স্যুটকেসে দুজনেরই জামাকাপড় ঠাসা। যত দ্রুত সম্ভব দেখে নিয়ে ওপরকার চেন টেনে হাত ভরলাম। অমলের অ্যাড এজেন্সির নেমকার্ড বেরুল অনেকগুলো। একটা নিলাম। তারপর একেবারে কোণা থেকে বেরুল একটা ইনল্যাণ্ড লেটার। দেখেই বুঝলাম, যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। সুমিত্রের চিঠি। ২৭ আগস্ট লেখা।

চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে পকেটে ভরে বললাম, 'তুমি এখানেই থাকো। আমার ধারণা, এখানে থাকাই তোমার পক্ষে নিরাপদ। কিন্তু সাবধান! আমি কিংবা অমল না ডাকলে দরজা খুলো না। জানালা দিয়ে আগে দেখে নিও। আর কোন হামলা হলে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি করবে। আশপাশের কটেজ থেকে লোকেরা বেরিয়ে আসবে। তবে আমার বিশ্বাস, তত কিছু ঘটবে না।'

দীপা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমার ভয় করছে। বরং আপনার হোটেলে—'

'না। সাহসী হও।'

বলেই আমি বেরিয়ে এলাম।...

জানতাম, যে টিলার ওপর এইসব কটেজ তৈরি করেছেন বিত্তবান মানুষেরা, তার নিচে বিচ নেই। ওদিকটায় গভীর খাঁড়ি। সমুদ্রের ধাক্কায় টিলার পাথুরে পাঁজর বেড়িয়ে পড়েছে। বাঁকের মুখে পেঁৗছে দেখলাম, সী ভিউয়ের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। একটা কেয়াঝোপের আড়ালে গেলাম। গাড়িটা চলে গেল চন্দনপুরম বসতির দিকে। এই গাড়িটাই হোটেলের পোর্টিকোতে দেখেছিলাম। সম্ভবত গোপালকৃষ্ণনকে হোটেলে ফেরত দিয়ে এল।

তারপর আচমকা ঝিরঝিরে বৃটি শুরু হল। বিরক্তিকর বৃষ্টি। প্রায় পৌনে এক কিমি চলার পর বাঁদিকে বিচে নামার রাস্তা। এখান থেকে সী ভিউয়ের আলো দেখা যাচ্ছিল। সংকীর্ণ পাথরের ইটে ঢাকা রাস্তার তুধারে কয়েকটা মাচা, যেখানে শঙ্খমালা, কড়ি, শঙ্খ এইসব সামুদ্রিক নিদর্শন বিক্রি করে স্থানীয় আদিবাসিরা। একটা মাত্র চায়ের দোকান, সিগারেট এবং পানও বিক্রি হয়—সেটার দেয়াল কাঠের, চাল টিনের তৈরি। এটা পুরনো বিচ এবং এর আয়ু নাকি কমে আসছে। বিচের ঢালু গড়ন দেখে সেটা অনুমান করা চলে। সামান্য দূরে সেই মোগল কি পর্তুগীজদের তৈরী পাথরের সারবন্দি পোড়ো ঘর। নতুন বিচ উত্তরে তু কিমি দূরে। চন্দনপুরম বসতি এলাকার কাছাকাছি। কিন্তু সে বিচের দৈর্ঘ্য বড়জোর পাঁচশো মিটার এবং অজস্র পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফেনিল সমুদ্রচূর্ণ মানুষজনকে মুহুর্মুহু ভিজিয়ে দেয়। বিব্রত করে।

এর কারণ, নতুন বিচে সামুদ্রিক হাওয়াকে বাধা দেওয়ার মতো কোনও আড়াল নেই, যা আছে পুরনো বিচে। পাথরের ঘরগুলো হাওয়াকে প্রতিহত করে। তাই মরসুমে যা কিছু ভিড়, তা পুরনো বিচেই। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ফাইলে পুরনো বিচের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হয়ে গেছে। অতএব সি ডি এ এখানে টাকা ঢালতে

চাননি। বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি। চায়ের দোকানটিতে হ্যাজাগবাতি জ্বলতে দেখেছি। এখন রাত সওয়া একটায় দোকানটা বন্ধ। টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেলে দোকানটার গা ঘেঁষে একটু দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টিটা থেমে গেল। তখন বিচে নেমে গেলাম। হঠাৎ মনে হল, কী বিস্ময়কর আমার আচরণ। বাতিঘরে পাখিওড়া পথে এগিয়ে যাওয়ার অ্যাডভেঞ্চার একটা কঠিন ঝুঁকি এবং সেই ঝুঁকি নিতে কদাচ চাইনি। কিন্তু এখন আমি ঝুঁকি নিচ্ছি।

আমার স্বভাব, ঝুঁকি নিলে আর পিছু হটি না। হটলাম না। পাথরের ঘরগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে উঁচু বালিয়াড়িতে ঝাউবনে উঠে গেলাম। সী ভিউ চোখে পড়ল।

এবার সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার শুরু হল। দিনের আলোয় বাইনোকুলারে যেমনটা দেখেছি, তেমনটি নয়। বড়-বড় পাথর, দুর্ভেদ্য শরবন এবং বালিয়াড়ি, দুর্গম জঙ্গলে ঢাকা ছোট-ছোট টিলা। টিলার নিচে গভীর খাঁড়িতে সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করছে।

কিন্তু আর পিছিয়ে আসা অসম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, বর্মাফ্রণ্টে একবার দলছাড়া হয়ে এমনি অবস্থায় পড়েছিলাম। কিন্তু তখন আমি তরুণ।

আবার একটা বালিয়াড়ি এল সামনে। কালো পাথর ঢুকে আছে বালির ভেতর। এতে সুবিধেই হল ওপরে ওঠার। আকাশে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দক্ষিণ এবং পূর্বে সমুদ্রের শিয়রে। একটু বিশ্রাম নিতে হল। সেইসময় পূর্বে অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে আলো জ্বলতে-নিভতে দেখলাম। বাইনোকুলার চোখে রাখতেই একটা জাহাজ দেখা গেল। ঢেউয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ছে বারবার। জাহাজটা যে দূরের সমুদ্রে সরে যাচ্ছে, তাতে ভুল নেই।

জাহাজ নিয়ে এখন চিন্তার মানে হয় না। আবার বিদ্যুৎ চমক দিল। এতক্ষণে সামান্য দূরে বাতিঘরটা দেখতে পেলাম। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বালিয়াড়ি থেকে নেমে পাথর আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে

বাতিঘরের টিলার নিচে পৌঁছলাম।

কিছুক্ষণ গুঁড়ি মেরে বসে চারিদিকটা খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠায় পারিপার্শ্বিক স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কোনও লোক নেই। সন্দেহজনক কোনও শব্দ শুনছি না, শুধু খাঁড়ির নিচের সামুদ্রিক গর্জন ছাড়া।

বাতিঘরের দরজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। কারণ ওদিকেই টিলায় ওঠার রাস্তা। রাস্তা বেয়ে ওঠার সময় হাওয়ার তোলপাড় ছিল। দরজার কয়েকমিটার দূরে পৌঁছে টর্চের আলো ফেললাম। চমকে উঠলাম। দরজা হাট করে খোলা!

সবে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ খাঁড়ির দিক থেকে একটা জোরালো হাওয়া এসে ধাক্কা দিল। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মনে হল, হাওয়াটা আমাকে টানছে। উপুড় হয়ে পড়ে হাতের কাছে একটা ঝোপের গোড়া চেপে ধরলাম। টর্চটাসুদ্ধ চেপে ধরেছিলাম। আমার রেনকোট খুলে যাওয়ার উপক্রম। তারপরই শুনলাম বাতিঘরের ভেতর তীক্ষ্ণশিসের শব্দ! শিঁ...ই...ই...ই... চিঁ...ই...ই....ই...

শব্দটা যেন সত্যি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। বাতিঘরের লোহার কপাটও ঝনঝন শব্দে কাঁপছে। শিসের শব্দে কানে সুচ ঢুকে যাচ্ছিল। টুপিটা উঠে গেছে কখন। মাথা কাত করে অন্য হাতে কানে আঙুল গুঁজে দিলাম। টর্চসুদ্ধ হাতটা ঝোপের গোড়া আঁকড়ে রইল। কারণ ওই হাতটা ছাড়লেই আমাকে হাওয়াটা টেনে নিয়ে গিয়ে বাতিঘরে ঢোকাবে।

কোনও সাংঘাতিক ঘটনা যত দীর্ঘক্ষণ বলে মনে হয়, আসলে ততক্ষণ ধরে ঘটে না। এই ঘটনাটা পাঁচ মিনিট, না তিন মিনিট, নাকি এক মিনিট ধরে ঘটল বলতে পারব না। তারপর সত্যি যেন শ্বাস ছাড়ার মতো শব্দ ভেসে এল সমুদ্রের দিক থেকে। অজস্র বাষ্পীয় রেলইঞ্জিনের একসঙ্গে বাষ্প ছাড়ার মতো আওয়াজ।

তাহলে 'স্নেকউইণ্ড' আমার দেখা হয়ে গেল! অদ্ভুত এবং

বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

এবং হয়তো আমি দৈবাৎ বেঁচে গেলাম। বাতিঘরে ঢুকে যাওয়ার পর ভূতুড়ে হাওয়াটা এসে পড়লে আমাকে নিশ্চয় ঘুরপাক খাইয়ে ওপরে তুলত এবং জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

ঘড়ি দেখলাম। রাত দুটো পঁয়ত্রিশ। টর্চের আলোয় টুপিটা সেই ঝোপের গায়ে আটকানো অবস্থায় খুঁজে পেলাম। এবার উঠে দাঁড়ানো উচিত। চুরুট টানাও খুব দরকার। যা দেখলাম, তা না বুঝে চলে যাওয়া উচিত হবে না।

বাতিঘরের লোহার কপাট ভেতরের দিকে খোলে। টর্চের আলোয় দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা তালার মাথার দিকটা কাটা এবং গলে গেছে কিছুটা। অ্যাসিটিলিন দিয়ে কাটা। অতএব মানুষেরই কাজ। তার মানে 'স্নেকউইণ্ড' দরজা ভাঙে না। সম্ভবত বাতিঘরের গায়ের ফোকরগুলো দিয়ে ঢোকে। এখন দরজা খোলা পেয়েছিল।

সাবধানে টর্চের আলো ফেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঘোরাল লোহার সিঁড়িতে কাদাবালি আর ঘাসের কুটোয় কি জুতোর ছাপ? আতস কাচে ছাপগুলো পরীক্ষা করলাম। কারা ওপরে উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে। অনেকগুলো ধাপ ওঠার পর কালো পাথরের দেয়ালে রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। রক্তটা টাটকা।

তাহলে কি কেউ একটু আগে ভেতরে ঢুকেছিল এবং স্নেকউইণ্ড ধাক্কা মেরে তাকে রক্তাক্ত করতে করতে ওপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলল? আমার যুক্তিবোধ ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। শরীর এবং মেধার পার্থক্য আমাকে বাঁচাল। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পিছু হটা আমার ধাতে নেই। প্রায় ষাট ফুট উঠতে জায়গায়-জায়গায় তেমনই দাগ এবং রক্তের ছোপ দেখতে পেলাম। ওপরতলায় প্রচণ্ড হাওয়ার তোলপাড়। কিছুক্ষণ বসে দম নেওয়ার পর পূর্বের জানলার ফাঁকে চাপচাপ রক্ত দেখে শিউরে উঠলাম। রক্ত সবে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

তারপর চোখে পড়ল মেঝেয় দেয়ালের নিচের খাঁজে আটকে

আছে একটুকরো ছেঁড়া দড়ি। স্নেকউইণ্ডের টানেই সম্ভবত খাঁজে আটকে গেছে। ইঞ্চি পাঁচেক রক্তাক্ত দড়ির একদিকটায় গিঁট আছে।

বৃত্তাকার পাথরের কুণ্ডের মতো একটা জায়গায় পর্তুগীজ বা মোগলরা আগুন জ্বালিয়ে রাখত। সেখানে প্রায় একমিটার গর্ত। ইন্ধন বোঝাই করার জায়গা। বাঁহাতের দুটো আঙুল চিমটের মতো করে দড়িটা তুলে সেখানে ফেলে দিলাম। কেন এমন করলাম জানি না। অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে, সম্ভবত ইনটুইশন এ ধরনের কাজ করায়।

এরপর আপাতত এখানে কিছু করার ছিল না। জুতোর ছোপ-গুলো আগের মতো এড়িয়ে নিচে নামলাম। তারপর বেরিয়ে গেলাম। ক্লান্তিতে পাথর শরীর টেনে-টেনে মাতালের মতো টলতে-টলতে হাঁটছিলাম।

এবার সোজা রাস্তায় ফিরে যাওয়াই উচিত। জনেশ্বরজীর সেই প্রাসাদপুরীতে আলো জ্বলছে। সেখানে রাস্তা এড়িয়ে গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা চলার পর পিচরাস্তায় উঠলাম। এ রাস্তা গেছে সী ভিউয়ের সামনে দিয়ে। জনেশ্বরজীর বাড়ি থেকে কিছুদূর অন্তর একটা করে লাইট ? পোস্ট। সেই হাল্কা আলোয় আমাকে দানব বা পিশাচ দেখানো স্বাভাবিক। সী ভিউয়ে পৌঁছুলাম রাত তিনটেয়।

দুজন নাইটগার্ডকে ঝিমোতে দেখছিলাম পোর্টিকোর সিঁড়িতে। গেট বন্ধ। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে গলার ভেতরটা শুকনো। জিভ ব্লটিং পেপার। গেটের রড ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। নিশুতি রাতের বিরক্তিকর এই শব্দ ওদের একজনকে জাগিয়ে দিল। সে আস্তে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল এবং এগিয়ে এল। ঘুমঘুম চোখে সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল।

আরুলাপ্পান রিসেপসন কাউন্টারে দুই পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল টেবিলে শব্দ করে তাকে জাগালাম। সে কয়েক সেকেণ্ড আমার

দিকে তাকিয়ে থাকার পর পা নামিয়ে একটু হাসল। 'এনিথিং রং স্যার?'

'নাহ্। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?'

'কেন নয়?' বলে সে বেরিয়ে গেল ডাইনিংয়ের দিকে।

কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আরুলান্থান জল এনে দিল। জল খেয়ে ধাতস্থ হলাম। এখন এক পেয়ালা কফির দরকার ছিল। কিন্তু রাত তিনটেয় সেটা আশা না করাই ভাল। আরুলান্থান আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, 'ম্যানেজার-সায়েব ফিরেছেন?'

'না। উনি সকালে ফিরবেন বলে গেছেন।'

চুরুট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকলাম। কী করা উচিত ভাবছিলাম। থানায় ফোন করে জানাব কি? সুমিত্রের মতোই নির্বোধ অমল ফাঁদে পা দিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছে। নাকি সেই ঘাতক হাওয়া—স্নেকউইণ্ডের পাল্লায় পড়েছিল।

আরুলান্থান কাউন্টারে ঢুকে বলল, 'আপনি কি ওদের ওখানে ছিলেন? কী ঘটেছে?'

'কাদের ওখানে?'

'সেই স্বামীস্ত্রী।' সে হাসল। 'অদ্ভুত লোক। আপনি যাওয়ার ঘণ্টাদেড়েক পরে এলেন।'

চমকে উঠলাম। 'কে?'

'ভদ্রমহিলার স্বামী। আমি বললাম আপনি ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। তখন চলে গেলেন ভদ্রলোক।'

'তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে?'

আরুলান্থান একটু অবাক হয়ে বলল, 'চেনার প্রশ্ন ওঠে না। ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন লাউঞ্জে ওঁর স্ত্রীর অপেক্ষা করার কথা ছিল। কাজেই আমি সব বললাম। তাছাড়া কুণ্ডনাথন আমাদের কথাবার্তা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। সে চেনে। কারণ সে ডিনার সার্ভ করেছিল ওঁদের। কিন্তু আপনি তাহলে কোথায় ছিলেন?'

'ভদ্রমহিলাকে তাঁদের কটেজে পৌঁছে দিয়ে বিচে বসে ছিলাম।'

'আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। প্রায় সওয়া তিনটে বাজে। আমার মনে হয়. এবার আপনার শুতে যাওয়া উচিত।'

উঠে দাঁড়ালাম। তখনও মনে প্রশ্ন, থানায় ফোন করে বাতিঘরে রক্তের খবর দেন কিনা।

'স্যার!'

'বলো।'

'ব্রাণ্ডি আছে। দেব কি? আপনাকে সত্যি বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।' বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাতিঘরে রক্ত অমলের নয়, এটা আপাতত আমার স্বস্তির কারণ। কিন্তু অমল কোথায় গিয়েছিল?...

যত রাত জাগি না কেন, ভোরে ঘুম ভাঙবেই। পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে যে কোনও সময়। আজ ছটায় ভেঙেছিল। সুইচ টিপে কুণ্ডনাথনকে ডাকলাম। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি আকাশ নির্মেঘ এবং নীলাভ। বাইনোকুলারে বাতিঘরটা দেখে নিলাম। প্রশ্নটা ধাক্কা দিল কার রক্ত?

কুণ্ডনাথন কফি নিয়ে হাজির হল। বলল, 'আপনি যাওয়ার পর সেই ভদ্রলোক—'

তাকে থামিয়ে বললাম, 'জানি। তো খাঁড়িতে কি লাস পড়েছে কুণ্ডনাথন?

সে বিব্রতভাবে বলল, 'জানি না স্যার। একটু বেলা হলে জানা যাবে।'

'কীভাবে জানা যাবে? এর আগে কীভাবে জানা গিয়েছিল?'

'জনেশ্বরজীর দারোয়ান বা কোনও কর্মচারী বাতিঘরের দিকে টাট্টিতে যায়। দরজা খোলা দেখলে, তাদের সন্দেহ হয়। আসলাম দরজা খোলে নটা থেকে দশটার মধ্যে।'

'এখন তো আসলাম পুলিসের হাজতে !'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ঠিক আছে। তুমি এস। আমি কফি খেয়ে বেরুব।'

কুণ্ডনাথন সেলাম ঠুকে চলে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলাম। 'আচ্ছা কুণ্ডনাথন! তুমি বলেছিলে বর্ষার পর এই এলাকায় জগন্নাথ প্রজাপতি দেখা যায়!'

কুণ্ডনাথনের আড়ষ্টতা কেটে গেল। 'অনেক স্যার! অনেক দেখা যায়।'

'তুমি বলেছিলে জগন্নাথ প্রজাপতি ধরা যায় না। আমি কিন্তু ধরব।'

সে একটু হাসল। 'দেবতাকে ধরা যায় না স্যার! ধরলে পাপ হয়।'

'জীবনে একটু-আধটু পাপ করে দেখা ভাল কুণ্ডনাথন!'

'আমি তা ঠিক মনে করি না স্যার!'

'কিন্তু কুণ্ডনাথন, আমরা কি না জেনেও কোন পাপ করতে পারি না?'

'আমি সামান্য লোক। আমি মনে করি, না জেনে পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেন না!'

'কুণ্ডনাথন! না জেনে আগুনে হাত দিলে কি হাত পোড়ে না!'

সে ভয়ার্ত চোখে তাকাল। তারপর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, স্পর্শকাতর জায়গায় খোঁচা দিয়েছি।

কিছুক্ষণ পরে গলায় ক্যামেরা, বাইনোকুলার এবং পিঠে কিট্-ব্যাগে প্রজাপতিধরা নেটের স্টিক গুঁজে বেরিয়ে গেলাম। লাউঞ্জ ফাঁকা। রিসেপসনে একজন অচেনা মধ্যবয়সী লোক ডিউটিতে এসেছে। সে খাতায় কিছু লেখালিখিতে ব্যস্ত।

বেরিয়ে কটেজের দিকে হাঁটছিলাম। রাস্তায় শর্টস পরা এবং হাতের চেনে বাঁধা অ্যালসেসিয়ান নিয়ে এক বৃদ্ধকে দেখলাম। চন্দন-পুরমের দিক থেকে ছুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে জগিং করে আসছে

দক্ষিণী চেহারা। আমার পাশ দিয়ে তিনটি তাজা যৌবন চলে গেল। ঘুরে তাদের কিছুক্ষণ দেখলাম। ওরা কি বাতিঘর পর্যন্ত যাবে?

কটেজ এলাকা এখনও শুনশান স্তব্ধ। ঘাসে গাছপালায় ভিজে কোমল ধূসরতা। এখনও প্রজাপতিদের বেরুনোর সময় হয়নি। রাতে দেখা কটেজটা খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। কিন্তু কাঠের গেটে তালা। ঘরের দরজায় তালা।

ভোরেই চলে গেছে? এখনও স্টেশনে গেলে হয়তো দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু এভাবে চলে যাওয়া কেন! বড় লজ্জার কারণ আমার পক্ষে। আমাকে ডিটেকটিভ ভেবেছে। ডিটেকটিভ কথাটা আমার বরাবর অসহ্য। একটা গালাগালিই গণ্য করি, কেন না বিচ্ছিরি 'টিকটিকি' টার্মে উৎস ওই কথাটাই।

তবে তুরুপের তাস এখন আমার হাতে। সুমিত্রের সেই চিঠিটা!

শেষপ্রান্তে একটা চওড়া পাথরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সূর্যোদয় দেখার জন্য। নিচে খাঁড়ি। পূর্বে সমুদ্রের শিয়রে লালচে মেঘ। মেঘ ক্রমে ঘন হচ্ছিল। সমুদ্র জুড়ে চাপ চাপ রক্ততরঙ্গ। অসহ্য লাগল। ফিরে এলাম।

হোটেলের আগে বাঁদিকে পুরনো বিচের পথ ধরলাম। মাচা-গুলো এখনও খালি। চায়ের সেই দোকানটা সবে খুলেছে। একটা বাচ্চা আঁচ দেবার যোগাড় করছে। একজন বুড়ো আদিবাসী বেঞ্চে বসে আছে। দোকানদার ধুনো জ্বেলে ধ্যান করছে।

বিচে সেই দৌড়বাজ ছেলেমেয়েদের দেখতে পেলাম। বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বালি মাখছে। একটি মেয়ে দুঃসাহসে সমুদ্র ধারণ করতে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেল। একটা বড় ব্রেকার ভাঙচুর হয়ে এসে তাকে ফেলে দিল। বাকি দুজন হেসে অস্থির হল। এবার তিনজনেই বুক পেতে দাঁড়াল।

এখন সমুদ্র গলানো সোনার। কালো মেঘগুলো উঠে আসছে সমুদ্র পেরিয়ে। ক্যামেরায় টেলিলেন্স এঁটে তিনটি যৌবনের সমুদ্রকে আহ্বানের ছবি নিলাম। তারপর বিচে নেমে গতরাতের মতো

অ্যাডভেঞ্চারে গেলাম।

এখন অবাক লাগছিল নিজের নৈশ স্পর্ধা স্মরণ করে। কী দুঃসাহস না দেখিয়েছি! পাথর, টিলা, জঙ্গল এবং বালিয়াড়ির দুর্গমতা তো বটেই, সাপের কথা ভাবিইনি! যেখানে-যেখানে আমার জুতোর ছাপ পড়েছিল বালি বা বালিমেশানো মাটিতে, সাবধানে মুছে বা তারওপর পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল, এই সতর্কতা অকারণ। শেষ বালিয়াড়ির মাথায় উঠতেই সামনে একটু দূরে বাতিঘরের নিচের খাঁড়ি দেখা গেল। আমার হাত কাঁপছিল। বাইনোকুলারে তন্নতন্ন খুঁজছিলাম কোনও ক্ষতবিক্ষত লাস।

কোনও লাস নেই। বাতিঘরের ওপরতলাটা দেখতে বাইনোকুলার তুলেছি, অমনি একটা লোক ধরা পড়ল বাইনোকুলারে। তার একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল। তার চোখেও বাইনোকুলার। সে দূরের সমুদ্রে কিছু দেখছে। কোনও টুরিস্ট? ঝটপট ক্যামেরায় টেলিলেন্স পরিয়ে তার ছবি নিলাম।

বালিয়াড়ি থেকে পিছু হটে নেমে একটা বড় পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসলাম। এখান থেকে সমুদ্র এবং বাতিঘরের শীর্ষ দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রের প্রকাণ্ড ব্রেকারগুলো বাধা। কাজেই বাতিঘরের লোকটাকে দেখতে থাকলাম। একটু পরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। গেল তো গেলই।

সময় কাটতে চায় না। কিছুক্ষণের জন্য রোদ ইচ্ছেমতো সবকিছুকে ছুঁয়ে থাকার পর সমুদ্রের দিকে সরে গেল। তারপর ঘন মেঘের ছায়া এসে পড়ল। বৃষ্টির ভয় করছিলাম। কিন্তু বৃষ্টিটা এল না। সেই লোকটা বেরিয়ে এল বাতিঘরের দরজা দিয়ে। অমনি আবার তার কয়েকটা ছবি তুললাম। সে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ওপাশের জঙ্গলে ঢাকা টিলার আড়ালে চলে গেল। কিন্তু তাকে চিনে ফেলেছি। সেই গুপ্টাসায়েব!

আর লুকোচুরি না করে বাতিঘরের নিচের রাস্তায় চলে গেলাম।

সেখান থেকে জনেশ্বরজীর বাড়ির গেট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। গুপ্টাসায়েব জঙ্গল ঘুরে যে পিচরাস্তায় পৌঁছেছিলেন তা বোঝা গেল। পিচরাস্তার বাঁক ঘুরে আস্তেসুস্থে এসে জনেশ্বরজীর বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

আমার মাথায় এখনও অন্য চিন্তা। বাতিঘরের পশ্চিমদিকে চলে গেলাম। তারপর বাইনোকুলারে নিচের খাড়িতে এতক্ষণে সত্যিই একটা লাস দেখতে পেলাম। কোনও অনিবার্যতার জন্য প্রস্তুত থাকলে বুদ্ধিশুদ্ধি টাল খায় না। খুঁটিয়ে দেখছিলাম, ফেনিল জলে দুলে দুলে ওঠা এবং পাথরের খাঁজে মাঝেমাঝে আটকে যাওয়া লাসের মাথাটা থেঁৎলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। পরনে পোশাক বলতে কিছু নেই। প্রকৃতি থেকে যেভাবে মানুষ আসে, সেইভাবেই ফিরে গিয়েছে।

আর এখানে থাকা ঠিক নয়। গুপ্টারও বাইনোকুলার আছে। ঝোপঝাড়ে মিথ্যে প্রজাপতি ধরার ভঙ্গিতে নেট খুলে কিছুক্ষণ ছুটো-ছুটি করার পর সোজা পিচরাস্তায় উঠলাম। তারপর মাঝেমাঝে আকাশে বুনোহাঁসের আগাম দু'একটা ঝাঁক খোঁজার চেষ্টা করতে করতে সী ভিউয়ের দিকে হাঁটতে থাকলাম।

তাহলে কুণ্ডনাথের কথাটা ঠিকই ছিল। বাতিঘরে লাল আলো দেখা গেলেই নিচের খাঁড়িতে লাস পড়া অনিবার্য।...

বেলা নটায় কুণ্ডনাথন আমার ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল। বিনীতভাবে সে জানতে চাইল, আমি জগন্নাথ প্রজাপতি ধরতে পেরেছি কিনা। আমি মাথা নাড়ায় সে একটু হাসল। চেষ্টাকৃত হাসি। গতরাত থেকে তার মুখে উদ্বেগ, অস্বস্তি এবং কাতরতার গাঢ় ছাপ লেগে আছে। সে কি বাতিঘরে আমার লাল আলো দেখার কথায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন সাধারণ লোকের প্রতিক্রিয়া?

সে চলে যেতে ঘুরেছে, তাকে ডাকলাম, 'কুণ্ডনাথন!'

সে তাকাল শুধু। আমার কণ্ঠস্বরে সন্দিগ্ধ হয়েছিল। বোবা চাউনি চোখে।

'ম্যানেজারসায়েব ফিরেছেন ?'

'না স্যার ?'

'কাল রাতে গুপ্টাসায়েবের গাড়ি এদিক থেকে ফিরে যেতে দেখেছিলাম।'

কুণ্ডনাথন একটু পরে বলল, 'গাড়ির শব্দ ত্ব'বার শুনেছি। একবার চন্দনপুরম থেকে এসে হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার, আর একবার—কিছুক্ষণ পরে আবার চন্দনপুরের দিকে যাওয়ার। রাতে আমার ভাল ঘুম হয়নি। আপনি ফিরলেন, তখনও জেগে ছিলাম।

'তার মানে, গুপ্টাসায়েব, ম্যানেজারসায়েব এবং সেই চুস্ত পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক প্রথমে চন্দনপুরমে যান। ম্যানেজারসায়েবের গত রাতে বাড়িতে থাকার কথা শুনলাম। আরুলাম্থান বা মেরীকে বলে গিয়েছিলেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গুপ্টা এবং সেই ভদ্রলোক জনেশ্বরজীর বাড়িতে ফেরেন। তারপর গাড়ি ফের চন্দনপুরমে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই ভদ্রলোককে পৌঁছে দিতেই গিয়েছিল। এরপর গাড়িটা ফিরে আসার কথা।'

'নিশ্চয় ফিরেছিল। তখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তুমি জানো ওটা গুপ্টাসায়েবের গাড়ি ?'

জানি। উনি এলেই ম্যানেজারসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

'ম্যানেজারসায়েবের তো গাড়ি আছে দেখেছিলাম।'

'শুনেছি গ্যারেজে দিয়েছেন। কলকজা খারাপ হয়েছে। 'কুণ্ডনাথন এবার একটু ইতস্তত করে বলল, 'কেন এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন স্যার ?'

'খাঁড়িতে একটা লাস দেখে এলাম।'

কুণ্ডনাথনের গোঁফ কাঁপতে লাগল। চোখ ত্বটো বড় হয়ে গেল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমি জানতাম !'

'লাসটা উলঙ্গ। মাথা থ্যাৎলানো। তাছাড়া বাতিঘরে প্রচুর রক্ত দেখেছি।'

'সেই সাংঘাতিক হাওয়ার পাল্লায় পড়েছিল কেউ।' সে ব্যস্ত-ভাবে বলল। 'দরজার তালা ভাঙা ছিল?'

'হ্যাঁ।' ব্রেকফাস্টের সঙ্গে আমার কথাও চলছিল। খাওয়াটা আজ দ্রুত সেরে নিচ্ছিলাম। ন্যাপকিনে হাতমুখ মুছে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, 'কিন্তু সমস্যা হল কুণ্ডনাথন, তালা মানুষেরই ভাঙা। গ্যাসকাটার দিয়ে কাটা হয়েছে।

সে উত্তেজিতভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'স্নেকউইণ্ডের তাপে তালা গলে যায় স্যার! পাঁচবারই দেখেছি তালা গলে গেছে। সবাই জানে।'

'পুলিশ কী বলে শুনেছ?'

'জানি না। আমি সামান্য লোক স্যার! তবে আসলামকে গ্রেপ্তার করার পর সবাই বলছে, আসলামই এ কাজটা করে। কিন্তু কেন সে তা করবে? এবার দেখুন, প্রমাণ হয়ে গেল। আসলাম থানার হাজতে থাকা সত্ত্বেও তালা গলে দরজা খুলে গেছে। বলুন স্যার! আসলাম কেন দোষী হবে?'

'কুণ্ডনাথন! বাতিঘরের খাঁড়িতে আমার লাস দেখার কথা চেপে যাও।'

'কিন্তু স্যার—'

'না। খবর পুলিসের কাছে বরাবর যে-ভাবে যায়, সেইভাবেই যেতে দাও।'

'ঠিক আছে স্যার!'

পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওকে দিলাম 'তোমার এবং মেরীর বখশিস।'

সে টাকা নিয়ে সেলাম ঠুকে চলে গেল। চুরুট টানতে টানতে চোখ বুজে ভাবছিলাম, এবার আমার কী করা উচিত। সেইসময়ে পেছনের রাস্তায় ক্রমাগত গাড়ির শব্দ কানে এল। উঠে গিয়ে জানলায় উঁকি দিলাম।

পুলিসের জিপ, একটা ভ্যান, একটা অ্যাম্বুল্যান্স আর একটা

ক্রেনবসানো লালরঙের ব্রেকভ্যান চলেছে কনভয়ের মতো। পুলিস যেভাবে খবর পায়, সেইভাবেই পেয়েছে তাহলে।

নিচে গিয়ে দেখি, হোটেল কর্মচারীরা অনেকে গেটের কাছে, কেউ পোর্টিকোতে উত্তেজিতভাবে জটলা করছে। কুণ্ডনাথনকে দেখতে পেলাম না। ধরেই নিলাম, সে বাতিঘরের খাঁড়ির দিকে ছুটে গেছে।

আস্তেসুস্থে হাঁটছিলাম পিচের রাস্তায়। একবার পিছু ফিরে দেখে নিলাম সাইকেল, সাইকেল রিকশ, মোটরবাইক এইসব যান-বাহনের ঝাঁক আসছে চন্দনপুরমের দিক থেকে। পায়ে হেঁটেও লোকেরা আসছে। স্নেকউইঙের ভয়ঙ্কর কীর্তি দেখতে এই উত্তেজিত অভিযান অনিবার্য ছিল। খবর হাওয়ায় রটে গেছে, নাকি ক্রেনটা দেখেই?

জনেশ্বরজীর প্রাসাদের গেটে চাকর-নোকর ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িটা লনে একটা গাছের তলায় নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিচ রাস্তা বেঁকে গেছে পশ্চিমে। রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। সেই রাস্তায় দশকিমি এগলে মাদ্রাজগামী, হাইওয়ে পড়ে।

আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার যাওয়ার পর বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর একফালি পায়ে চলা পথ চোখে পড়ল। এই পথেই তখন গুপ্টাসায়েব বাতিঘর থেকে ফিরেছিলেন সম্ভবত।

পথটার ওপর কাঁটালতাগুল্ম ঝুঁকে আছে। প্রজাপতিধরা নেটস্টিক দিয়ে কাঁটা সরিয়ে-সরিয়ে হাঁটছিলাম। তারপর একটুকরো খোলা বালিয়াড়িতে পৌঁছলাম। বালিয়াড়িতে শরবন আর কেয়া-ঝোপ অজস্র। অনেক পাথরও গেঁথে আছে। হঠাৎ একটা কেয়া-ঝোপের তলায় কালোবালির এলোমেলো বিন্যাস দেখে থমকে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সেখানে গেলাম। হাঁটু মুড়ে বসে দেখি, এখানে কিছু পোড়ানো হয়েছিল এবং ছাইগুলো বালিতে ইচ্ছে করেই মেশানো হয়েছে।

হাতড়াতে গিয়ে চমকে উঠলাম। কোনও সিন্থেটিক জিনিসই পোড়ানো হয়েছে। আতস কাচে পরীক্ষা. করে নিশ্চিত হওয়া গেল, জিনিসটা ফোটোফিল্ম।

তলায় হাত ভরে ওলটপালট বালির সঙ্গে যে আধপোড়া কুচি বেরুলো. সেগুলো অবশ্যই ফটোগ্রাফের।

এ অবস্থায় সুমিত্রের ক্যামেরাটা কোথায় যেতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়। দামি জাপানি ক্যামেরা খাঁড়ির জলে ফেলার মানে হয় না। গোপালকৃষ্ণন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সুমিত্রের তোলা কিছু ছবির নেগেটিভ এবং প্রিন্ট যে এখানে পোড়ানো হয়েছে. এতে আমি নিশ্চিত।

কেয়াঝোপের তলায় দুষ্কর্মটা করা হয়েছে। তাই তা কাল রাতে বৃষ্টির আগে না পরে, বোঝা গেল না। লক্ষ্য করলাম. চারপাশে বালির অবস্থা কেমন যেন অস্বাভাবিক। পায়ের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা স্পষ্ট। তবে সেটা সম্ভবত ভোরের দিকে আলো ফোটার পর করা হয়েছে।

আমার নিজের পায়ের ছাপ নষ্ট করার অর্থ হয় না। ঝোপটা গলিয়ে গেলাম, কেন গেলাম জানি না—অনেক সময় দেখেছি ইনট্যুই-শন আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। কেয়াপাতার কিনারার কাঁটা থেকে বাঁচতে গিয়ে টুপ টুপ করে লাল কয়েকটা ফোঁটা পড়ল। বালি তক্ষুনি সেগুলো শুষে নিল।

ওপাশে ঝলমলে রোদ পড়েছে। কারও রক্ত ছিটকে এসে পড়েছিল কেয়াঝোপটায়। রাতের বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। সামনের বালি এবং ঘাসে ঢাকা বালিমেশানো মাটির দানাগুলো বাইনোকুলারের কাচে সেঁটে পাথরের চাঁইয়ের মতো দেখাচ্ছিল। ঘাসের পাতাও অস্বাভাবিক চওড়া। তলায় রক্তের খয়েরি ধারা ছড়িয়ে আছে। তবে বালিটা এলোমেলো করে দেওয়া হয়েছে।

হত্যাকাণ্ডটা তাহলে এখানেই হয়েছিল। তারপর বাতিঘরের দরজার তালা গলিয়ে খুলে লাসটা তুলে নিয়ে গিয়ে ওপরতলার

জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলা হয়েছিল। তাই জানালায় অত বেশি রক্ত দেখেছি।

কিন্তু এসব কাজ মাত্র একজনের সাধ্যের বাইরে। একাধিক লোক ছিল।

তবে এবার আমি বুঝে গেছি লাসটা কার। কাজেই কোনও গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে বসে চুরুট টানা যেতে পারে।

হোটেলের গেটে পৌঁছে পুলিসের দর্শন পেলাম। পুলিসের গাড়ি ছাড়াও কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় এবং পোর্টিকোর তলা পর্যন্ত প্রলম্বিত। বোঝা যাচ্ছিল হোটেলের মালিকরা এবং স্থানীয় হোমরা-চোমরা লোকেরাও এসেছেন। আরুলাম্বান পোর্টিকো থেকে বেরুল। ভাঙা গলায় বলল, 'দা ব্লাডি স্নেকউইণ্ড।'

'ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণনকে মেরেছে?'

আরুলাম্বান বুকে ক্রস এঁকে আস্তে বলল, 'পুলিস ঝামেলা করছে। বোর্ডারদেরও জেরা করছে। আমি বুঝতে পারছি না কেন লোকটা রাত্রে বাতিঘরে গিয়েছিল। পুলিসের এই পয়েন্টটা ঠিক।'

পোর্টিকোয় আমাকে দেখে এক পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি বোর্ডার?'

'হ্যাঁ।'

'লাউঞ্জের একপাশে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আপনাকে প্রশ্ন করা হবে।'

লাউঞ্জে সম্ভ্রান্ত চেহারার কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। গুপ্টাসায়েবকেও দেখতে পেলাম। দুজন অফিসার জেরা করছেন মেরীকে। কুণ্ডনাথন কাতরমুখে ডাইনিং হলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

রিসেপসনের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলাম। মেরীকে জেরা শেষ করে একজন অফিসার আমার দিকে তাকালেন। নিভে যাওয়া

চুরুট জ্বেলে নিলাম। কানে এল, 'আপনি এখানে আসুন। শুনতে পাচ্ছেন?'

কথার ভঙ্গিতে পুলিসের চিরাচরিত অশালীনতা। কিন্তু পুলিসকেই আমার এবার বেশি দরকার। কাছে গিয়ে সামনাসামনি একটা খালি আসনে বসে পড়লাম।

'আপনি বোর্ডার?' বলে অফিসার হোটেল রেজিস্টারের পাতায় চোখ রাখলেন। 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নাম? কলকাতা থেকে? বেড়াতে এসেছেন? বয়স সত্তর? আপনি তো রিটায়ার্ড সামরিক অফিসাব?'

পকেট থেকে নেমকার্ডটা বের করে দিলাম।

কার্ডটা দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'নেচারিস্ট, কী?'

একটু হেসে বললাম, 'প্রকৃতির মধ্যে রহস্য খুঁজে বেড়াই। বিরল প্রজাতির পাখি আর প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করি। অর্কিড দেখলে সংগ্রহ করি। ছবি তুলি।'

অফিসারদ্বয় হাসলেন না, যদিও আমার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট রসিকতা ছিল। অপরজন বললেন, 'গত রাতে বারোটা নাগাদ আপনি বেরিয়েছিলেন?'

'একটি মেয়েকে তার কটেজে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম।'

'জানি। কিন্তু আপনি ফিরেছিলেন রাত তিনটে নাগাদ। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'সী বীচে!'

'অদ্ভুত!'

'আমি একজন অদ্ভুত মানুষ, অফিসার!'

'রসিকতা করবেন না। আপনি যে সত্যি কর্নেল ছিলেন, প্রমাণ দাবি করছি।'

প্রমাণ দিচ্ছি। আগে এই ছবিটা দেখুন, চিনতে পারেন কি না।'

কিটব্যাগ পিঠ থেকে নামিয়ে ছবিটা বের করতে যাচ্ছি, প্রশ্ন এল, 'ওটা কি ছাতা?'

'নাহ্। প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক।'

'আপনার সবই অদ্ভুত।'

'ঠিক ধরেছেন। এবার ছবিটা দেখুন।'

ছবিটা দুজনে দেখাদেখি করলেন। তারপর প্রশ্ন এল, 'কার ছবি? কটেজের সেই যুবকটির? তাকে আমরা ধরে ফেলব। কলকাতায় খবর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য জানি না কলকাতার পুলিস কতটা সহযোগিতা করবে। তারা তো রাজনীতি সামলাতেই ব্যস্ত থাকে।'

আস্তে বললাম, 'সবই ইংরেজি দৈনিক ও নিখোঁজ তালিকায় এই ছবি বেরিয়েছিল।'

'আমরা লক্ষ্য করিনি।'

'২৮শে আগস্ট সকালে এর লাস আপনারা বাতিঘরের খাঁড়িতে পেয়েছিলেন।'

দুজন অফিসারই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে একজন বললেন, 'মিলিয়ে দেখতে হবে। বিকৃত লাসের ছবি থানায় আছে। কিন্তু আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন, ব্যাখ্যা চাইছি।'

'ব্যাখ্যা খুব জটিল। আপাতত এটুকু বলতে পারি, যুবকটি একজন ফোটোফিচারিস্ট।'

'আপনার আত্মীয়?'

'বলতে পারেন। সে এখানে এসেছিল সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত সেমিনার কভার করতে। তার লাস ওই খাঁড়িতে পাওয়া যায়। আপনারা শনাক্ত করতে পারেননি বা চেষ্টা করা হয়নি। সে এই হোটেলে ২৭শে আগস্ট ছদ্মনামে চেকইন করেছিল। রেজিস্টার দেখুন। এ. কে. দাশগুপ্ত। তার লাসের খবর পেয়েই গোপালকৃষ্ণন ঝামেলার ভয়ে পরদিন ভোরে চেকআউট দেখিয়েছিলেন।'

দুই অফিসার রেজিস্টারের পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত হলেন। খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, 'আপনি তা হলে নিছক বেড়াতে আসেননি? কে আপনি?'

'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।'

'আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!'

'ছিঃ! কথাটা একটা গালাগাল। আমি গোপালকৃষ্ণনের কাছে কথায়-কথায় সব জেনেছি।'

'আপনি সত্যিই অদ্ভুত লোক। যাই হোক, গোপালকৃষ্ণন মারা পড়েছেন। কাজেই আপনার জানার সত্যমিথ্যা ঠিক করা কঠিন।'

গোপালকৃষ্ণন আমাকে বলেছেন, বাতিঘরের স্নেকউইণ্ড কলকাতার ফোটোফিচারিস্টের মৃত্যুর কারণ। জনেশ্বরণীরও মৃত্যুর কারণ। গোপালকৃষ্ণনের মৃত্যুর কারণও তা হলে স্নেকউইণ্ড। সেই সাঙ্ঘাতিক ঘাতক হাওয়ার কবলে পড়ে ছটা মানুষের প্রাণ গেল। আমি গম্ভীর মুখে বলছিলাম কথাগুলো। চুরুটে শেষ টান দিয়ে কাছাকাছি একটা ছাইদানিতে ফেলে দিলাম। তারপর বললাম, 'কাল রাতে সী বিচে বসে থাকার সময় আমি দূরে কোথাও অদ্ভুত ধরনের শিসের শব্দ শুনেছিলাম। স্নেকউইণ্ড নাকি শিস দিতে দিতে সমুদ্র থেকে উঠে এসে বাতিঘরে ঢোকে। শুধু এটাই আমি বুঝতে পারছি না ছজন লোক পরপর অতরাত্রে বাতিঘরে কেন গিয়েছিল?

গুঁফো কালো বেঁটে অফিসারটি তীক্ষ্ণদৃষ্টে আমাকে দেখছিলেন। একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'আপনি শিসের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?'

'তা-ই তো বললাম।'

'কিছু দেখতে পেয়েছিলেন?'

'তেমন কিছু না। তবে দূরের সমুদ্রের একটা জাহাজের আলো দেখেছিলাম। আর—'

'বলুন!'

'সন্ধ্যার পরই আমার ঘরের ব্যালকনি থেকে বাতিঘরের মাথায় লাল আলো দেখেছিলাম। আলোটা দুবার জ্বলে নিভে গিয়েছিল।'

'লাল আলো? অফিসারটি তাঁর সহযোগীর দিকে তাকালেন।

সহযোগী অফিসার সাদা পোশাকপরা। নিশ্চয় পুলিসের

গোয়েন্দা। আস্তে বললেন, 'কুণ্ডনাথনও দেখেছে। কাজেই এটা একটা পয়েন্ট।'

বললাম, 'গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। লাল আলো দেখা গেলে স্নেকউইণ্ড আসে এবং খাঁড়িতে লাস পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি, হাওয়াটা এত গরম যে বাতিঘরের দরজার তালা গলে যায়—'

'আপনি কী শুনেছেন, সেটা কথা নয়। কী দেখেছেন সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

'যা যা দেখেছি, বললাম।'

'আপনি কবে কলকাতা ফিরবেন ঠিক করেছেন?'

'কিছু ঠিক করিনি। অন্তত একটা জগন্নাথ প্রজাপতি না ধরা পর্যন্ত ফিরছি না।'

'গুঁফো অফিসার চোখ পাকিয়ে বললেন, রসিকতা পছন্দ করি না। আপনি আমাদের অনুমতি ছাড়া কলকাতা ফিরতে পারবেন না।'

বেশিদিন থাকার মতো টাকাকড়ি আমার নেই। সী ভিউয়ের খরচ বড্ড বেশি।'

গোয়েন্দা অফিসার একটু হেসে বললেন, 'টাকা ফুরিয়ে গেলে আমাদের জানাবেন।'

'আপনারা টাকা দেবেন নাকি?'

'নাহ্। আপনি আমাদের গেস্ট হয়ে থাকবেন।'

'লকআপে নয় তো?'

'হ্যাঁঃ।' নিজের রসিকতায় গোয়েন্দা অফিসার নিজেই হেসে উঠলেন।

গুঁফো অফিসার বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি আসুন। দরকার হলে থানায় ডেকে পাঠাব।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এবার সত্যিই জগন্নাথ প্রজাপতি ধরার অভিযানে চলেছি। অন্তত বাকি ফিল্মগুলো শেষ করে দুপুরেই প্রিন্ট করে ফেলতে হবে। বাইরে গেলে বাথরুম আমার এই কাজে ডার্করুম হয়ে ওঠে। সঙ্গে ওয়াশ—

ডেভালাপ প্রিন্টের সরঞ্জাম থাকে। বিশেষ করে এবার তো তৈরি হয়েই এসেছিলাম।

জগন্নাথ প্রজাপতি ধরা সত্যিই অসম্ভব। দুটো ডানা মেললে জগন্নাথদেবের মূর্তির আদল ফুটে ওঠে বলেই লোকেরা এই নাম দিয়েছে। বাইনোকুলারে দেখলাম রঙের আঁকিবুকিতে ওইরকম একটা রূপ ধরে নেওয়া যায়। এদের বোধশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে তিনমিটার দূর থেকেই টের পায় হামলা আসছে। তবে ছবি নেওয়ার অসুবিধে ছিল না। বিচ দিয়ে ঘুরে আবার একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল। অনেক সময় নিজেই জানি না কী করছি এবং কেন করছি।

দেখলাম, বাতিঘরের দরজায় আবার তালা আঁটা হয়েছে। পুলিস 'রুটিন জবে'র পথ ধরে চলে এবং নিঃসাড়, কৌতূহলহীন একটি শ্রেণীতে পরিণত। এ বিষয়ে আমার একটা অনবদ্য অভিজ্ঞতা আছে। বহুবছর আগে গ্রীষ্মের এক দুপুরে কলকাতা রাজভবনের উত্তরফটকের কাছে একটা লোক একজনকে ছুরি মারতে যাচ্ছে এবং আক্রান্ত লোকটি ড্রেনে নেমেছে। কাছাকাছি আর মানুষজন ছিল না সেই মুহূর্তে। শুধু ফটকে এক পুলিসপ্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার কোমরে চামড়ার খাপে ফায়ার আর্মস। আমার তাড়া খেয়ে আততায়ী পালিয়ে গেল। তখন প্রহরীটিকে বললাম, তার চোখের সামনে একটা মানুষ খুন হতে যাচ্ছিল এবং তার কাছে তো ফায়ার আর্মস আছে। সে গম্ভীর মুখে বলল, সে রাজভবনে 'ডিউটি' করছে। কাজেই বাইরে কী ঘটছে, তা নিয়ে তার কিছু করার নেই। বললাম, তবু একজন মানুষ হিসেবে কিছু করার ছিল না কি? অন্তত একটা ধমকই যথেষ্ট ছিল। প্রহরীটি আরও গম্ভীর হয়ে বলল, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, তার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। তাতে তার ঝামেলা বাড়বে।

কোনও একটি পদ্ধতির প্রতি যান্ত্রিক আনুগত্যই রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়। যাইহোক, আলব্যের কামু-কথিত 'প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী গেরিলা' সম্পর্কে পরে ভাবা যাবে। বাতিঘরের সামনে দিয়ে দক্ষিণের টিবির দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছু ফিরে দেখলাম, দরজার কাছাকাছি একটা বেঁটে ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়ানো দুজন বন্দুকধারী পুলিসপ্রহরী আমার দিকে হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করছে। অতএব আমি চলে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের সমান্তরালে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে একটা জেলে বসতি চোখে পড়ল। ঢালু বালিমেশানো মাটি ও পাথরের ওপর অজস্র ভেলানৌকো রাখা আছে। বসতির পেছনদিকের মাঠে জাল শুকোতে দেওয়া হয়েছে। মাঠটার ওধারে বহুদূর ছড়ানো লালফুল দাগড়াদাগড়া ফুটে আছে সবুজ ঢেউখেলানো কার্পেটে। বাইনোকুলারে সেই হাইওয়েটি দেখা যাচ্ছিল টিলা পাহাড়ের ফাঁকে।

বলেছি নিজের উদ্দেশ্যসম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। বসতি থেকে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এল কয়েকটা কুকুর। তারপর নাকে ঝাপটা দিল শুঁটকি মাছের পচা গন্ধ। কুকুরগুলোর অভ্যর্থনায় সাড়া না দেওয়ায় তারা ক্রমশ অবাক হতে হতে থেমে যাচ্ছিল। এইসময় উলঙ্গ ছোট ছেলেমেয়ের একটা দল 'সায়েব! সায়েব!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাকে ঘিরে ধরল। অভ্যাস অনুযায়ী তাদের চকোলেট বিলি করলাম এবং ছবি তুললাম। তারা চমৎকার পোজ দিল।

একটা কুঁড়েঘরের পিছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়োমানুষ আমাকে দেখছিল। সমুদ্রের লোনা জল এই নুলিয়াদের প্রচণ্ড কালো এবং ক্ষয়াটে প্রত্নভাস্কর্য করে ফেলে। ব্রেকার বেরিয়ে দূরের সমুদ্রে এদের অভিযান দেখেছি। যথার্থ সমুদ্রজয়ী এইসব আদিম বীরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।

বুড়ো ভাঙাভাঙা হিন্দিতে তার ছবি তুলতে চাইল। ইচ্ছাপূরণ করলাম। বসতির ভেতর মেয়েরা সব কষ্টিপাথরের যক্ষিনী এবং

যে যার জায়গায় টেরাকোটা হয়ে সেঁটে আছে। বুড়ো আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, সব জোয়ান এখনও মাঝদরিয়ায় লড়ছে। তবে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। বিকেলে চন্দনপুরম থেকে ট্রাক এসে দূরের রাস্তায় দাঁড়াবে। তারা মাছ পৌঁছে দেবে। তবে কোনও দিন মাছ আশাতীত হয় কোনওদিন তেমন কিছুই না।

বললাম, বাতিঘরের খাঁড়িতে লাস পড়ার খবর সে জানে কি না?

সে শুনেছে।

এ নিয়ে দুমাসে ছটা লাস পড়ল। তাই না?

তা ই হবে। তবে এই বসতির তিনজন লাস হয়েছে।

তারা অতরাতে সমুদ্রে গিয়েছিল কেন?

সেটা তারাই জানে। বাতিঘরে রাতবিরেতে 'কাণ্ডিলম' আসে।

স্নেকউইণ্ড? (মুখ ফসকে ইংরেজি বেরিয়ে গেল।)

হাওয়াসাপ। বাতিঘরের নিচে সমুদ্রের তলায় সুড়ঙ্গে তার বাসা।

'কাণ্ডিলম' কি বরাবর আসে ওখানে?

আসে। তার ঠাকুর্দা একবার তার পাল্লায় পড়েছিল। জোর বেঁচে যায়। তিনপুরুষ ধরে মুলিয়ারা জানে 'কাণ্ডিলমের' উপদ্রবের কথা। তাই তারা কখনই বাতিঘর এলাকার সমুদ্রে যায় না। রাতে যাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না তবে তারা হাওয়া শুঁকে টের পায় কখন কাণ্ডিলম সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবে।

তিনজন রাত্রে গিয়েছিল। কাণ্ডিলম তাদের মেরেছিল। কেন গিয়েছিল তারা?

বসতির কেউ জানে না কেন গিয়েছিল। পুলিস খুব ঝামেলা করেছিল। তাদের বাবা-মায়েরা কিছু জানলে তো বলবে?

ভেলানৌকো নিয়েই গিয়েছিল কি?

হ্যাঁ। বসতির অনেক জোয়ান আছে, খাঁড়িতে ঢেউ বা পাথরের পরোয়া করে না। ওই তো সমুদ্রে কত পাথর দেখা যাচ্ছে। সেগুলো এড়িয়ে মাঝদরিয়ায় যেতে জানে মুলিয়ারা।

জনেশ্বরজীকে কি চেনে সে?

নামে জানে। রাজার অতবড় বাড়ি কিনেছিল যে, তার অনেক টাকা। 'কাণ্ডিলম' তাকে মারল।

মাছ বিক্রি করা হয় কার কাছে?

চন্দনপুরমে মাছের আড়তদার আছে। তার নাম দণ্ডরাঘবন।

গুপ্টাসায়েবকে কি সে চেনে?

কে সে? এমন নাম তার জানা নেই। কিন্তু তাকে এ সব প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে? সায়েব কি সরকারের লোক?

'না' বলে তাকে একটা কুড়ি টাকার নোট দিলাম। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইতস্তত করে সে দু-হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল এবং মাথায় ঠেকাল। তারপর কোমরের কাপড়ে গুঁজল। এবার জিজ্ঞেস করলাম, এই সমুদ্রে জাহাজ সে দেখেছে কি না?

রোজই দু-একটা জাহাজ মাঝদরিয়া দিয়ে যায়। দিনে যায়, রাতেও যায়।

কাছাকাছি স্পিডবোট দেখেছে কখনও দিনে বা রাতে।

সেটা কী জিনিস?

নৌকোর মতো গড়ন। প্রচণ্ড জোরে ছোটে। যন্ত্র তাকে ছোটায়।

একটি মেয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। বলে উঠল, 'বোট্টা! বোট্টা!'

বুড়ো মুলিয়া বলল, হ্যাঁ বোট্টা। একবার রাতে দেখেছিল মনে পড়ছে।

মেয়েটি বলল, সে একবার নয়, কয়েকবার বোট্টা' দেখেছে। খুব জোরালো আলো।

বুড়ো গম্ভীর মুখে বলল, 'কাণ্ডিলম'।

মেয়েটি তার সঙ্গে মাতৃভাষায় তর্ক জুড়ে দিল। তর্ক থামাতে মেয়েটিকে দশটা টাকা দিতেই হল। প্রায় একটা বাজে। এবার ফিরতে হবে।

বাইনোকুলারে দেখে নিলাম, কোথাও কেউ আমার দিকে লক্ষ্য রেখেছে কিনা। তারপর হাত নেড়ে তাদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম। কুকুরগুলো দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাল।

ছবির নেগেটিভগুলো চমৎকার ছিল। সবগুলো প্রিন্ট করার দরকার ছিল না। বাতিঘরের ওপরে এবং নিচে দরজার সামনে গুপ্টাসায়েবের মোট তিনটে ছবি প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম। 'ডার্করুমে'! সেই ছবি শুকোতে দিয়ে ব্যালকনিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম। পাঁচটা বাজে। এখন কফি দিয়ে যাওয়ার কথা কুণ্ডনাথনের।

পাঁচমিনিট দেরি করে সে এল। চেহারায় ঝড়ঝাপটা খাওয়া কাকতাড়ুয়ার ছাপ। বললাম, তুমি কি অসুস্থ কুণ্ডনাথন?

সে আস্তে বলল, 'না। আমার কিছু হয়নি।

'কাণ্ডিলম তা হলে ম্যানেজারসায়েবকে মারল!'

'কাণ্ডিলম?' সে অবাক চোখে তাকাল। 'না স্যার! ম্যানেজারসায়েব জানতেন রাতে বাতিঘরে কাণ্ডিলম আসে। উনি কেন যাবেন সেখানে? ওঁকে খুন করে খাঁড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

'তুমি জানো?'

কুণ্ডনাথন জোরে মাথা নাড়ল। 'জানি না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে।' একটু দ্বিধার সঙ্গে সে খুব আস্তে বলল, 'আপনাকে বলছিলাম, রাতে তুবার গাড়ির শব্দ শুনেছি। আরুলাম্বান বলছিল, চুস্ত পাঞ্জাবিপরা যে লোকটা এসেছিল সে এলাকার সাংঘাতিক গুণ্ডা মাছের কারবার আছে লোকটার।

'লোকটার নাম দণ্ডরাঘবন?'

সে চমকে উঠে বলল, 'আপনি চেনেন তাকে?'

'নাম শুনেছি। তো তুমি পুলিসকে বলেছ দণ্ডরাঘবন আসার পর গুপ্টাসায়েব এবং ম্যানেজার সায়েব বেরিয়ে যান?'

'বলেই ভুল করেছি। আরুলাম্বান চালাক ছেলে। দণ্ডরাঘবন

আমাকে মেরে ফেলবে।' কুণ্ডনাথন কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, আমি মরতে ভয় পাই না। কিন্তু আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে বুড়ো বাবা মায়ের কী হবে?'

'দণ্ডরাঘবন কেন ম্যানেজারসায়েবকে খুন করবে?'

'গুপ্টাসায়েব ওকে দিয়ে খুন করিয়েছেন। আমার সন্দেহ।'

'গুপ্টাসায়েব কেন গোপালকৃষ্ণনকে খুন করাবেন?'

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খুব আস্তে কুণ্ডনাথন বলল, 'জনেশ্বরজী মারা যাওয়ার দিন গুপ্টাসায়েব হোটেলে এসেছিলেন। ম্যানেজার-সায়েবের ঘরে দুজনে কী নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। আমি চা দিতে গেলাম। দুজনের মুখ খুব গম্ভীর দেখলাম। চলে আসার সময় কানে এল গুপ্তাসায়েব বলছেন, ঠিক আছে এক লাখই দেব। এক সপ্তাহ সময় চাই। করিডরে একটু দাঁড়ালাম। আর চড়া গলায় কথা হচ্ছিল না। তবে একটা কথা কানে এল। ছবি।'

'ছবি?' আমি শান্তভাবেই বললাম, 'ছবির বদলে লাখ টাকা!'

কুণ্ডনাথন শ্বাস ছেড়ে বলল, 'তাই হবে। এখন মনে হচ্ছে ছবি নিয়েই ঝগড়া হচ্ছিল।'

আমার উত্তেজনার কোনও কারণ তার ছিল না। বললাম, রিসেপসনে এখন কে আছে?

'মেরী।'

'ঠিক আছে। তুমি এস।

কুণ্ডনাথন টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। উঠে গিয়ে দরজা এঁটে ডার্করুমে ঢুকলাম। আলো জ্বেলে দেখলাম, ছবি শুকিয়েছে। তিনটে ছবি খুলে নিয়ে দড়িটা খুললাম। লিণ্টেনের মাথায় আটকান কালো কাপড়টা খুলে ফেললাম। 'ডার্করুম' আবার বাথরুম হয়ে গেল।

বাকি কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে ঘরদোর বন্ধ করে নিচে গেলাম। মেরীকেও এ-বেলা কাতর দেখাচ্ছিল। সে আমাকে দেখে আস্তে বলল, 'গুড ইভিনিং স্যার।'

ইভনিং! মেরী, একটা টেলিফোন করতে চাই। থানার নাম্বারটা জানো?'

'এক মিনিট। আমি ধরে দিচ্ছি।'

সাড়া পেয়ে সে আমাকে টেলিফোন দিল। বললাম, 'অফিসার ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই। হোটেল সী ভিউ থেকে বলছি। আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।'

'একটু ধরুন।'

প্রায় এক মিনিট পরে ভারী গলায় সাড়া এল। 'বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। সী ভিউ হোটেল থেকে।'

'হ্যাঁ। আমাদের অফিসার আপনার কথা বলেছেন আমাকে। আপনি কি কলকাতা ফিরতে চাইছেন? দুঃখিত কর্নেল সরকার! তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত—'

'তদন্ত শেষ।'

'তদন্ত শেষ? আমি রসিকতা পছন্দ করি না।'

'আমিও না। কয়েকটা কাজ এখনই করা উচিত পুলিসের। না হলে আমি মাদ্রাজ কাস্টমসকে ট্রাঙ্ককল করতে বাধ্য হব।'

'কী বললেন? কাস্টমস?'

'হ্যাঁ। কাস্টমস এবং এনফোর্সমেণ্টের অ্যান্টিনার্কোটিক ডিপার্ট! ওরা আমাকে চেনে না।'

'আপনি অদ্ভুত কথাবার্তা বলছেন!'

'মন দিয়ে শুনুন এবং লিখে নিন। দেরি করবেন না। গোপালকৃষ্ণনের বাড়ি সার্চ করুন। বাতিঘরের কয়েকটা ছবি পাওয়ার চান্স আছে। কোনও ক্যামেরা পেলে সীজ করুন। গোপালকৃষ্ণন বুদ্ধিমান ছিলেন। কাজেই একলাখ টাকার লোভে নেগেটিভগুলো দিলেও কয়েকটা প্রিন্ট রেখে দেওয়ার চান্স আছে। দুই: মাছের আড়তদার দণ্ডরাঘবনকে এখনই গ্রেফতার করুন। সে গোপালকৃষ্ণনের খুনী। তিন: জনেশ্বরজীর বাড়িতে গুপ্টাসায়েবকেও অ্যারেস্ট

করুন। বাড়িটা তন্নতন্ন সার্চ করুন। ওর গাড়িটাও। নার্কোটিকসের পেটি পেয়ে যেতে পারেন। এই কেস প্রমাণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তিনজন মুলিয়া, কলকাতার ফোটোফিচারিস্ট সুমিত্র গুহরায়, জনেশ্বরজী এবং গোপালকৃষ্ণনকে কাণ্ডিলম স্নেকউইণ্ড মারেনি। মেরেছে গুপ্টা এবং দণ্ডরাঘবন। অন্তত গোপালকৃষ্ণনকে কোথায় মারা হয়েছে, আমি দেখিয়ে দেব। 'কোনও সাড়া না পেয়ে বললাম, 'হ্যালো! আমার কথা বুঝতে পারলেন কি?'

'দেখছি।'

'দেখছি নয়। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। খুনীরা পালিয়ে গেলে আপনি দায়ী হবেন।'

ফোন রেখে দিলাম। দেখলাম, মেরী চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। স্ফীত নাসারন্ধ্র। প্লেটে আঁকা মুখ। একটু হেসে তাকে আশ্বস্ত করলাম, তোমার উদ্বেগের কিছু নেই।'

লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছিলাম। জোরালো বৃষ্টি এসে গেল। আলোয় বৃষ্টি দেখতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু পুলিসের দুটো গাড়ি গেছে জনেশ্বরজীর বাড়ির দিকে। এখনও ফিরছে না। রফা করে ফেলল কিনা বলা যায় না! গুপ্টাকে দেখেই বুঝেছিলাম খলিফা লোক।

এইসময় টেলিফোন বাজল। মেরী ভীতু গলায় ডাকল, আপনার টেলিফোন স্যার!'

উঠে গিয়ে সাড়া দিলাম।

'কর্নেল সরকার? অফিসার-ইন-চার্জ মোহন আচারিয়া বলছি। দণ্ডরাঘবন লক-আপে। গোপালকৃষ্ণনের বাড়িতে পাঁচটা কালার-প্রিন্ট পেয়েছি। ফ্ল্যাশে তোলা। গুপ্টা আর দণ্ডরাঘবন খাড়ি থেকে দড়িতে কিছু টেনে ওঠাচ্ছিল। পরপর ছবি সাজিয়ে বোঝা গেল, গুপ্টা দড়িটা ধরে একটা পেটি ওঠাচ্ছিল খাঁড়ি থেকে। দুঃসাহসী

ফোটোগ্রাফারকে তেড়ে এসেছিল দণ্ডরাঘবন। হাতে একটা ছোট লোহার রড।'

হ্যাঁ ফোটোগ্রাফার সুস্মিত্র গুহরায়কে মেরে বডিটা বাতিঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে খাড়িতে ফেলা হয়েছিল। মুখটা গোপালকৃষ্ণনের মতোই বিকৃত করা হয়েছিল। আমার ধারণা, জনেশ্বরজী গুপ্টার এই কারবার জানতে পেরে তাকে হুমকি দেন। তাই পার্টি চলার রাতে তাঁকেও কোনও ছলে ডেকে এনে একইভাবে মারা হয়। কাণ্ডিলম চমৎকার আবহাওয়া তৈরি রেখেছিল।

বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনজন নুলিয়াকে মারার কারণ কী?'

'দণ্ডরাঘবন মাছের কারবারী। নুলিয়াদের সঙ্গে তার ভাল চেনা জানা আছে। জাহাজ থেকে স্পিডবোটে নার্কোটিকস পেটি পাঠানো হয়েছে। স্পিডবোট পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার চান্স আছে। কাজেই নুলিয়াদের ভেলানৌকোর সাহায্য নেওয়া দরকার ছিল। দণ্ডরাঘবনের কাছে কথা আদায় করুন। আমার ধারণা তিনজন ডানপিটে নুলিয়া ব্ল্যাকমেল করছিল ওদের। তাই তিনজনকে একে-একে খতম করেছিল। যাইহোক, ক্যামেরার কী খবর?'

'পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা পয়েন্ট স্পষ্ট হচ্ছে না কর্নেল সরকার! গোপালকৃষ্ণন ক্যামেরা পেলেন কীভাবে?'

'মৃতরা আর কথা বলবে না। তবে পয়েন্টটা ব্যাখ্যা করা চলে। গোপালকৃষ্ণনও সম্ভবত গুপ্টার দলে ছিলেন। গুপ্টা প্রায়ই হোটেলে আসতেন। ঘটনার সময় গোপালকৃষ্ণন যেভাবেই হোক, ক্যামেরাটা হাতিয়েছিলেন। সুমিত্রের হাত থেকে ছিটকে পড়ে থাকবে।'

'কিন্তু গোপালকৃষ্ণন ছবিতে নেই।'

'তা হলে নিশ্চয় পিছনে আড়ালে কোথাও গার্ড দিচ্ছিলেন।'

'কর্নেল সরকার! আমার মনে হচ্ছে, ফোটোগ্রাফার পালাতে গিয়ে গোপালকৃষ্ণনের পাল্লায় পড়েন। গোপালকৃষ্ণন তাঁর ক্যামেরা কেড়ে নেন!'

তা-ও সম্ভব। দণ্ডরাঘবন এসে ফোটোগ্রাফারের মাথায় রড মারে বাকিটা স্পষ্ট।'

'ধূর্ত গোপালকৃষ্ণন ক্যামেরার ফিল্ম প্রিন্ট করিয়েছিলেন। কোথায় করিয়েছিলেন আমরা খুঁজে বের করব। তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন। গোপালকৃষ্ণনও মুলিয়াদের মতো। গুপ্টা এবং দণ্ডরাঘবনকে ব্ল্যাকমেল শুরু করেন। তাই গতরাতে তাঁকে মারা হয়।

'হ্যাঁ। নেগেটিভগুলোর বদলে এক লাখ টাকা দাবি করেছিলেন গোপালকৃষ্ণন। সাক্ষী আছে। কোথায় নেগেটিভগুলো কয়েকটা প্রিন্টসমেত পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছে, আমি দেখেছি। কিন্তু গুপ্টার খবর পেলেন?'

'জনেশ্বরজীর বাড়িতে ওকে ধরা হয়েছে। বাড়ি সার্চ এখনও শেষ হয়নি। আমি ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর রঘুনাথ মিশ্রকে বলেছি, আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

'ধন্যবাদ। রাখছি।'

ফোন রেখে দিলাম। তারপর ঘরে ফিরে অমলকে লেখা সুমিত্রের চিঠিটা আবার খুঁটিয়ে পড়লাম। অমলের আচরণ, কাণ্ডিলমের মতো রহস্যময়। দেখা যাক, কোনও সূত্র মেলে কিনা।

অমল,

তাড়াতাড়ি লিখছি। একটা চমকপ্রদ স্টোরির খোঁজ পেয়েছিলাম এখানে। হেডিং দিলাম 'চন্দনপুরম বাতিঘরে রহস্যময় হাওয়াসাপ, কিন্তু গতরাতে বাতিঘরের কাছে হাওয়া-সাপের জন্য ওঁত পাততে গিয়ে অন্য একটা রোমাঞ্চকর স্টোরির খোঁজ পেলাম। নার্কোটিকস স্মাগলিং র‍্যাকেট। হোটেল সী ভিউ ওদের রদেঁভু। অপারেশন জোন হল বাতিঘর। তাই আজ বিকেলে সী ভিউয়ে এসে উঠেছি। সতর্কতার জন্য তোর নাম ঠিকানা ব্যবহার করেছি। কারণ তোর দাদা তো মাদ্রাজ পোর্টে কাস্টমস-চিফ। আমার কিছু বিপদ হলে তুই যেন অ্যাকশন নিস। এখানে চলে আসতেও পারিস। দীপাকে সঙ্গে আনলে

বাড়তি আনন্দ পাবি। দীপারও ভাল লাগবে। বন্য আদিম সমুদ্রের একটা আলাদা স্বাদ আছে। প্রেমের জন্যও আছে অবাধ নির্জনতা। তোদের দুজনকেই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ইতি

সুমিত্র

ইনল্যাণ্ড লেটার। আতসকাচে স্থানীয় ডাকঘরের তারিখটা পড়া যাচ্ছে ২৭ আগস্ট। কলকাতার ডাকঘরের ছাপ খুব অস্পষ্ট। ২ এবং 'এস' থেকে বলা চলে ২ সেপ্টেম্বর। তা হলে অমল মুখ বুজে ছিল কেন? সব কাগজে সুমিত্রের ছবি ছাপা হয়েছিল। চোখ এড়িয়ে গেলেও দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জয়ন্ত চৌধুরীকে তার না-চেনার কারণও নেই। আজ ১৫ সেপ্টেম্বর। অমল আর দীপা এখানে এসেছিল ১৩ সেপ্টেম্বর। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, দীপাকে কাল রাতে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে কোথায় গিয়েছিল সে? ফিরল রাত একটায় এবং ভোরে দুজনে কটেজ থেকে উধাও হয়ে কলকাতা ফিরে গেল কেন?

বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেল। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের গর্জন পরিশ্রুত হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বনিতে রূপ নিয়েছে। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ব্যালকনিতে গেলাম। আবার প্রশ্নটা ফিরে এল। অমলের আচরণ কাণ্ডিলমের চেয়ে রহস্যময়…।

ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার রঘুনাথ মিশ্র রুটিনমাফিক জানিয়ে গিয়েছিলেন, গুন্টার গাড়ির সামনের আসনের তলার খোঁদলে তিনটে নার্কোটিকসের পেটি পাওয়া গেছে। মোট দাম আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা। পেটিগুলো ওয়াটার প্রুফ কালো রঙের উৎকৃষ্ট পলিথিনে তৈরি, যা নাকি গুলি করেও ফাটানো যায় না। পূর্ব উপকূলের বন্দরে বন্দরে মাল পৌঁছে দিয়ে 'দা ওডিসি' নামে যে বিদেশি জাহাজটি ঘুরছে, তাকে তাড়া করা হবে। ওই জাহাজ থেকেই স্পিডবোটে পেটিগুলি নামিয়ে জেলিয়াদের জেলেনৌকোয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তবে কোনও প্রমাণের আশা কম।

আর কাণ্ডিলম সম্পর্কে জেলিয়াবসতিতে একটা আশ্চর্য খবর

মিলেছে। স্থলিয়ারা সন্ধ্যার দিকেই সমুদ্রের হাবভাবে নাকি টের পায়, বাতিঘরের নিচের খাঁড়িতে সুড়ঙ্গের ভেতর কাণ্ডিলমের ঘুম ভাঙছে। তাই বাতিঘরের ওপর উঠে আগাম লাল আলো জ্বেলে জাহাজকে নিষেধ করা হয়েছিল, আজ রাতে মাল পাঠিও না।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। প্রকৃতির রহস্য অন্তহীন। আমিও কাণ্ডিলমের এক প্রত্যক্ষদর্শী। তবে শিসের শব্দের একটা ব্যাখ্যা সম্ভব—যদিও ভুল বা ঠিক এ দাবি করছি না। বাতিঘরের ভেতর ঘোরালো সিঁড়ির মেরুদণ্ড হিসেবে যে লোহার ফাঁপা থামটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি সুপ্রাচীন। কোথাও কোথাও ছিদ্র থাকা সম্ভব। যার ভেতর দিয়ে সামুদ্রিক নৈশ ঘূর্ণি হাওয়াটা ঢুকলে তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ হতে পারে। সকালে গিয়ে খুটিয়ে দেখতে হবে।

রঘুনাথ মিশ্রের কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত ছিল। সেটা স্বাভাবিক। কে এক বুড়োহাবড়া অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী কর্নেল তাঁর মতো ঝানু গোয়েন্দা অফিসারকে টেক্কা দিল। তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা হজম করা শক্ত।

রাত সাড়ে নটায় ডিনার সেরে লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আরুলাপ্পান রিসেপসনে পা-দুটো তুলে দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে পপ শুনছিল (আর কী শুনবে তা ছাড়া ?) এবং কুণ্ডনাথন এসে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে গেল, আর তাকে আমার দরকার আছে কিনা। ছিল না।

একটু পরে দেখি, গেটের কাছে একটা সাইকেল রিকশ এসে দাঁড়াল। যারা নামল, তারা আমার বুকের ভেতরকার পুরনো যন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিল। অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে বহুবার আমার থিওরিকে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছে। এবারও তাই হল আর কী!

উঠে দাঁড়ালাম অভ্যর্থনার জন্য। নিশ্চয় আমি হেরে গেছি কোথাও। আস্তে বললাম, 'তোমরা—'

দীপা দ্রুত বলল, 'আপনার ঘরে চলুন।'

ঘরে গিয়ে ব্যালকনিতে বসলাম। ওরাও বসল। বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা কলকাতা চলে গেছ।'

দীপা বলল, 'না। আমরা ট্রেনের টিকিট বদলাতে গিয়েছিলাম।'

'সারাদিন কোথায় ছিলে?'

'নিউ-বিচের একটা হোটেলে'। দীপা একটু হাসল। 'অমল এত ভীতু জানতাম না। আপনাকে ভয় পেয়েছিল। আমিই টানাটানি করে ওকে নিয়ে এলাম। রিকশ দাঁড়িয়ে আছে। বেশি ক্ষণ বসব না।'

'বলো অমল!'

অমল বিব্রতমুখে বলল, 'সুমিত্রের চিঠিটা আপনি নিয়ে এসেছেন শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। অথচ এখানে আমার থাকা দরকার।

চিঠিটা পেয়েও তুমি চুপ করে ছিলে কেন? কাগজে সুমিত্রের ছবি বেরিয়েছিল।'

চিঠি আমি পেয়েছি ১২ সেপ্টেম্বর। গুয়াহাটি এবং শিলং থেকে ফিরেছি, সেদিনই ডাকে চিঠিটা এল। দীপার মুখে কাগজে সুমিত্রের ছবির কথা শুনলাম। সেদিনই আমার ম্যাড্রাসি বন্ধু আইয়ারকে বলে ওর কটেজের চাবি নিলাম। রেলে দালালের থ্রু দিয়ে দুটো বার্থ ম্যানেজ করলাম।'

'এক মিনিট! চিঠিটা তুমি ১২ সেপ্টেম্বর পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

হাসলাম। 'অদ্ভুত! ডাকঘরের সিল থেকে শ্রীমান ১ বেমালুম অদৃশ্য। আমি পড়েছি ২ সেপ্টেম্বর। যাইহোক, তারপর?'

'কাল সন্ধ্যায় সী-বিচে বসে থাকার সময় বাতিঘরের ওপর দুবার লাল আলো জ্বলতে এবং নিভতে দেখলাম। দূরের সমুদ্রে একটা জাহাজ থেকেও দুবার সার্চলাইটের মতো আলো জ্বলে নিভে গেল। সুমিত্র সী-ভিউ হোটেলের কথা লিখেছিল। তাই ভাবলাম, আজ রাতেই একটা অপারেশন হবে। অপারেশন-জোন বাতিঘর। তাই

লাউঞ্জে দীপাকে বসিয়ে রেখে চুপিচুপি বাতিঘরে গিয়েছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছি, টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে কারা আসছে দেখলাম। তারা বাতিঘরের দিকে এল না। দক্ষিণের জঙ্গলে ঢুকে গেল। কোনও সাড়া নেই আর। চলে আসব ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি বাতিঘরের দরজায় নীল আলোর ফ্ল্যাশ।'

'গ্যাসকাটারে দরজার তালা কাটছিল।'

'তা-ই হবে। এবার ভাবলাম, পুলিশকে খবর দেওয়ার সময় হয়েছে। ফিরে এসে দীপাকে নিয়ে কটেজে যাব আগে। তারপর পুলিশ স্টেশন। এই ছিল প্ল্যান। কিন্তু এই হোটেলে ফিরে শুনি দীপাকে আপনি কটেজে রাখতে গেছেন। আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। ক্ষমা চাইছি।'

কপট চোখ পাকিয়ে বললাম, 'ক্ষমা নেই। বলো। তারপর হেসে ফেললাম।

অমল বলল, 'কটেজ থেকে আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি গেলাম। দীপার মুখে শুনলাম আপনি আমাদের জিনিসপত্র সার্চ করে সুমিত্রের চিঠিটা নিয়ে গেছেন। আমার আর থানায় যাওয়া হল না। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। উল্টে এবার আমিই না ফেঁসে যাই। দুজনে মরিয়া হয়ে কটেজ ছাড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে বাস-স্টেশনে গেলাম। রাত তিনটেয় একটা বাস রেলস্টেশন হয়ে ম্যাড্রাস যায়।

দীপা তাকে থামিয়ে বলল, 'আমি ওকে ইনসিস্ট করলাম টিকিট রিফান্ড করতে। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললাম। শেষে রাজি হল। কিন্তু কটেজে গেল না। সারাদিন ভয়ে কাটাল। যে হোটেলে উঠেছি, ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাই বাইরে খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম, একটা স্মাগলিং র‍্যাকেটের লোকেরা ধরা পড়েছে। তখন—

বাধা দিয়ে বললাম, 'অমল, তুমি মাদ্রাজে তোমার দাদাকে খবর দিয়েছ?'

অমল বলল, 'সুমিত্র জানত না। দাদা দিল্লি এয়ারপোর্টে আছেন এখন।'

দীপা উঠে দাঁড়াল। 'চলি কর্নেল সায়েব। বরং সকালে আসব। আমরা আরও তিনদিন থাকছি।'

ওদের বিদায় দিতে গেলাম লাউঞ্জ পর্যন্ত। তারপর আস্তে বললাম, 'যৌবন চরম সাহস দেখাতে পারে শুধু একটি ক্ষেত্রে। যাই হোক, শুভরাত্রি!'

দীপা তাকিয়েই চোখ নামাল! ভারতীয় নারীর সেই ঐতিহ্য-গত শালিনতা, যার আটপৌরে নাম লজ্জা। আর অমল নিতান্ত গাড়োলের মতো হেসে গেল। সে জানত না, তার জীবনের বাতি-ঘরে রহস্যময় কাণ্ডিলম ঢুকেছে।...

বরকধঝ-কচতটপ রহস্য

প্রস্তাবনা

আজ রাতেও আবার সেই উপদ্রব।

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?

সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" তারপর বিকট সেই অট্টহাসি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

একেবারে জানালার বাইরে এই বদমাইসি এবং ঠিক এই সময়টাতে কে জানে কেন লোডশেডিং হচ্ছে কদিন থেকে। জুন মাসের অসহ্য গরম। হাতপাখা নাড়তে নাড়তে সবে একটু তন্দ্রা মতো এসেছে, হঠাৎ কাল রাতের মতোই ছিঁড়ে গেল। তারপর জানালায় একটা ছায়া মুখ। চাপাস্বরে কেউ বলে উঠল—বরকধঝ কচতটপ-বরকধঝ কচতটপ।

—তবে রে ব্যাটাচ্ছলে! পাগলামির নিকুচি করেছে। বলে অমরেশ উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি আবার হা হা করে হাসছে কাল রাতের মতোই।

কালরাতে ধমক দিয়েছিলেন অমরেশ। পাগলাটা কেটে পড়েছিল। কিন্তু আজ রাতে ধমক, শাসানি, তর্জন গর্জনেও কাজ হল না। বিছানায় মাথার কাছে টর্চ ছিল। টর্চ জ্বেলে ছড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পাশের ঘরে নন্দিনী চীনা লণ্ঠনের আলোয় একটা প্রেমের উপন্যাস পড়ছিল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এখন যাকে বলে রিল্যাক্সিং মুড। তা ছাড়া রগরগে প্রেমের কাহিনী এই উৎকট গরমকে ভুলিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

বাবার চ্যাঁচামেচি এবং দরজা খুলে বেরুনোর শব্দ আবছা তার কানে এসেছিল। বিরক্ত হয়ে বলল—কোনও মানে হয়?

সেকেলে বিশাল খাটে সুধাময়ীর বুকে হাতপাখাটা চুপচাপ পড়ে

আছে। ঘুমের ওষুধ খান সুধাময়ী। নন্দিনী অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে, তার বাবার মতো জোরে না হলেও মায়ের নাক ডাকে। নন্দিনীর কথায় নাক ডাকা থেমে গেল। ঘুমজড়ানো গলায় বললেন —বংকার মাকে বলিস খবর দেবে।

নন্দিনী হেসে ফেলল।—কী বংকার মা বংকার মা করছ! বাবার কীর্তি ছাখ গিয়ে।

—হুঁ। বলে সুধাময়ী পাশ ফিরলেন।

শহরতলির এই পাড়াটা নিঝুম সুনসান এখন। শুধু মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। পিছনের বস্তিতে অনেক রাত অব্দি কী সব হৈ হুল্লোড় চলে। তারপর সম্ভবত লোকেরা ক্লান্ত হয়েই ঘরে-বাইরে যে-যেখানে পারে, শুয়ে পড়ে পাশের রাস্তার ওধারে সম্প্রতি কয়েকটা নতুন বাড়ি হয়েছে এবং হচ্ছে। এখানে-ওখানে খানাখন্দ, ডোবা, ঝোপজঙ্গল এবং পোড়ো ঘাসজমি। তার ওধারে কী একটা কারখানা হবে নাকি! বাউণ্ডারি ওয়াল তৈরি হয়ে গেছে। শুওরের খোঁয়াড়, গোরু-মোষের খাটাল, তারপর একটা খাল পেরিয়ে গেলে রেলকলোনি এবং রেলইয়ার্ড।

নন্দিনী বইয়ের পাতায় চোখ রাখল বটে, কিন্তু মন বাবার দিকে। কাল রাতে এক পাগলা নাকি বাবাকে খুব জ্বালিয়েছে। এ ঘর থেকে পাগলার পদ্য আওড়ানো শোনা গিয়েছিল। এ রাতে নন্দিনী অতটা খেয়াল করেনি। পাগলার কণ্ঠস্বর বেশ নাটকীয় ধরনের। যাত্রাদলের অভিনেতা ছিল হয়তো। ভাবতে মজা লাগে, রাত-বিরেতে একটা লোক মৃত্যুকে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে! পদ্যটা পরিচিত মনে হয় নন্দিনীর। কোথায় যেন পড়েছে, মনে করতে পারেনি।

নন্দিনী টেবিল ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত একটা পনের বাজে। বাবা ফিরছে না। পাগলাটাকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে নাকি। বাবারও অবশ্য একধরনের পাগলামি আছে। রাতদুপুরে বাড়ির পাশে কুকুরেরা ঝগড়া বাধালে ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ে। পাড়াছাড়া করে ফেরে।

পুরনো আমলের একতলা বাড়ি। একটুকরো উঠোন আছে। উঠোনের কোণায় টিউবেল আছে। শিউলি জবা চাঁপাফুলের গাছ আছে। লণ্ঠনটা হাতে করে নন্দিনী দরজা খুলে বারান্দায় বেরুল। আস্তে ডাকল—বাবা!

তার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বস্তিটা নাকি রাজ্যের চোর-ডাকাত-ছিনতাইয়ের ডেরা। আশে-পাশে 'ভদ্রলোকদের' বাড়িতে একসময় নাকি রাতবিরেতে খুব চোর পড়ত। নন্দিনীর ছোটবেলায় তাদের বাড়িতেও চোর ঢুকেছিল, মায়ের কাছে গল্পটা অনেকবার শুনেছে। কিন্তু তার মনে পড়ে না কিছু। বরং তার ধারণা, বস্তির লোকগুলো বেশ ভদ্রই। কখনও ওখানকার কোনও ছেলে-ছোকরা তার পিছনে লাগেনি। বরং 'ভদ্রলোকদের' বাড়ির রক-বাজরা তার পিছনে শিস দিয়েছে। অশালীন কথা আওড়েছে।

তা হলেও নন্দিনীর অবচেতনায় বস্তিবাসীদের সম্পর্কে গোপন একটা আতঙ্ক আছে। এই মুহূর্তে জবাগাছের আড়াল থেকে যদি চোর-ডাকাত বেরিয়ে আসে?

নন্দিনী লক্ষ্য করল, উঠোনের সদর দরজা বন্ধ। তার মানে, বাবা বসার ঘর খুলেই বেরিয়েছে। তার বাবা প্রাক্তন স্কুলটিচার। শোবার ঘরের সবখানে বই ঠাসা। বাইরের বসার ঘরেও তিনটে আলমারি ভর্তি বই। ওই ঘরে বাবা একসময় একদঙ্গল ছাত্র পড়াত। নিজের বয়সের ক্লান্তি আর নন্দিনীর মায়ের অসুখ-বিসুখ এইসব নানা কারণে টিউশনি ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল আর বাবাকে আগের মতো বই পড়তেও দেখে না নন্দিনী। চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকেন অমরেশ।

বারান্দায় রাখা একটা নড়বড়ে টেবিলে চীনা, লণ্ঠনটা রেখে নন্দিনী দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাগলাটার পাল্লায় পড়ে বাবাও কি পাগল হয়ে গেল? সে একবার ভাবল, বসার ঘর দিয়ে গিয়ে বাইরের রাস্তাটা দেখবে। কিন্তু এবার তার রাগ এসে গেল। চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ুক। তার কী?

রাগের বশেই সে লণ্ঠনটা তুলে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, এতক্ষণে বিদ্যুৎ এসে গেল। বারান্দায় চল্লিশ ওয়াটের বাতিটা সারারাত জ্বলে। ঘরে টেবিলবাতিটা জ্বলে উঠল। ঘড় ঘড় শব্দে পুরনো সিলিং ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। এবার আর মাকে ওঠানো দূরের কথা, একটুও জাগানো যাবে না!

আলো আসার পর এতক্ষণে এলাকার নিঝুম ঘোরটাও কেটে গেছে। কাছাকাছি কোথাও কুকুর ডাকল। নন্দিনী বসার ঘরে চলে গেল। বাইরের দরজা হাট করে খোলা। রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে। সে সুইচ টিপে এ ঘরের আলো জ্বালল। তারপর দরজায় উঁকি দিল। এক চিলতে বারান্দা ছিল একসময়। কিন্তু রকবাজদের জন্য ভেঙে দিতে হয়েছিল। জায়গাটা ঢালু করে বাঁধানো কাচ আর অজস্র পেরেকের ডগা উঁচিয়ে আছে। কয়েক ধাপ সংকীর্ণ সিঁড়ি করা হয়েছে দরজার নীচে। সিঁড়িতে নেমে রাস্তার দুধারে তাকিয়ে কাকেও দেখতে পেল না নন্দিনী।

শুধু একটা ঘেয়ো কুকুর আস্তেসুস্থে হেঁটে চলেছে। বাঁদিকে বস্তির গলির মোড়ে কুকুরটা গিয়ে তাড়া খেল। একদঙ্গল কুকুর চ্যাঁচামেচি করে তাকে তাড়িয়ে পাড়াছাড়া করতে গেল।

কিন্তু বাবা কোথায় গেল? নন্দিনীর অস্বস্তি হচ্ছিল। পাশের বাড়ির তারাজেঠুকে ডাকবে ভাবল। কিন্তু অমরেশ এক পাগলের পিছনে তাড়া করেছেন, এই ব্যাপারটা বড় হাস্যকর। তারাজেঠু যা লোক, রঙ চড়িয়ে গল্প রটিয়ে বেড়াবেন সবখানে। বাবার প্রেসটিজ থাকবে না। এমনিতেই তো অনেকে আজকাল তার বাবাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে।

বিরক্ত আর খাপ্পা নন্দিনী উঠে এসে দরজা বন্ধ করল। কিন্তু ঘরের আলোটা নেভাল না। সে তার বাবার শোবার ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। ফ্যানটার সুইচ টেপা ছিল। সেটা ঘুরছে। শূন্য বিছানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নন্দিনী নিজের ঘরে ফিরল। দরজা এঁটে দিল।

চীনা লণ্ঠন নিভিয়ে টেবিলবাতির সুইচ অফ করে সে মায়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বাবা এলে ডাকাডাকি করবে। করুক। এই পাগলামির কোনও মানে হয়?

কিন্তু নন্দিনীর ঘুম আসছিল না। টেবিলঘড়ির আবছা টিকটিক শব্দ কানে আসছিল। অমরেশের ডাক শোনার জন্য সে কান খাড়া করে আছে। অমরেশের ফেরার নাম নেই।...

এক

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ খি খি করে হেসে বললেন—খাইছে। যত্ত সব পাগলের কারবার!

জিজ্ঞেস করলাম—পাগল কী করেছে হালদার মশাই?

—পলাইয়া গেছে। বলে হালদারমশাই পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করলেন। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে স্বগতোক্তি করলেন—বুঝি না। একজন পাগল পাগলাগারদ থেক্যা পলাইয়া গেছে। তো তার ছবি ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দিয়া লিখছে, খোঁজ দিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। ক্যান?

হাসি চেপে বললাম—পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলে নিশ্চয় এর পেছনে কোনও রহস্য আছে। আপনি এই রহস্য-ভেদ করুন হালদারমশাই!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ আমার রসিকতা গ্রাহ্য করলেন না। তেতো মুখে বললেন—কে পাগল? যে পলাইয়া গেছে, না যে বিজ্ঞাপন দিছে সে? কর্নেল স্যার কী কন?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা বই খুলে কী একটা ছবি দেখ-ছিলেন। চওড়া টাকে জানালার পর্দার ফাঁক গলিয়ে আসা সকালের রোদ এসে প্রজাপতির মতো নাচানাচি করছে। ঠোঁটে কামড়ানো

চুরুট থেকে ছাই খসে পড়েছে তাঁর ঋষিসুলভ সাদা দাড়িতে। বললেন—হালদারমশাই, পাগলের বিজ্ঞাপন তো পড়লেন। কিন্তু পাগলের খবরটা মিস করলেন ?

প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার সোজা হয়ে বসলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন—মিস করলাম ?

কর্নেল বই বুজিয়ে রেখে দাড়ির ছাই ঝেড়ে বললেন—হ্যাঁ। তিনের পাতায় ডানদিকের কলম দেখুন।

হালদারমশাই কাগজ খুলে খবরটা বিড়বিড় করে পড়তে শুরু করলেন। গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপতে থাকল।—পাগলের হাতে প্রাক্তন শিক্ষকের মৃত্যু ! অ্যাঁ ! কী কাণ্ড !···

পড়া শেষ হলে হালদারমশাই আবার একটিপ নস্যি নিলেন। গুলি গুলি চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাগজটা দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা, আমি যার স্পেশ্যাল রিপোর্টার। কিন্তু খবরের কাগজে যা কিছু বেরোয়, আমার কাছে তার সবটাই পাঠ-যোগ্য নয়। বিজ্ঞাপন যেদিন কম থাকে, সেদিন অনেক হাবি-জাবি খবর দিয়ে জায়গা ভর্তি করতে হয়। কিন্তু একইদিনের কাগজে পাগল পালানোর বিজ্ঞাপন আর পাগলের হাতে কারও মারা পড়ার ঘটনা একটু অদ্ভুত লাগল। কাগজ টেনে নিয়ে খবরে চোখ বুলিয়ে রেখে দিলাম। বললাম—বোগাস ! পুলিশসোর্স থেকে টেলিফোনে পাওয়া। সন্ধ্যার পর লালবাজারে ফোন করে জেনে নেওয়া হয়—'দাদা, আজ কিছু আছে নাকি ? তেমন কিছু নেই ? না—না। প্লিজ দাদা, যা হয় একটা কিছু দিন।' হাসতে হাসতে বললাম—রোজ সন্ধ্যার পর আমাদের এক রিপোর্টারের এই ডায়ালগ শুনি।

আমার কথা হালদারমশাইয়ের মনঃপুত হলো না। মাথা নেড়ে বললেন—দুপুর রাত্রে লোডশেডিংয়ের সময় এক পাগল আইয়া শিক্ষকেরে জ্বালাতন করছিল। উনি তারে তাড়া করলেন। তারপর আর বাড়ি ফিরলেন না। পরদিন সকালে শিক্ষকের বডি পাওয়া

গেল খালের ধারে। স্কালে ক্র্যাক।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—প্রাক্তন শিক্ষক অমরেশ রায়ের বাড়ি থেকে সেই খালের দূরত্ব প্রায় আধ কিলোমিটারের বেশি।

—অ্যাঁ? হালদারমশাই চমকে ওঠার ভঙ্গি করলেন।—কিন্তু খবরে তা তো লেখে নাই। অত্তোদূরে পাগলেরে তাড়াইয়া লইয়া গেছিলেন শিক্ষক ভদ্রলোক? ক্যান? উনিও দেখি এক পাগল।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন—পাগলের পাল্লায় পড়লে কোনও কোনও সুস্থ লোক পাগল হয়ে যান সম্ভবত। কারণ আগের রাতেও একই সময়ে ওই পাগল ওকে জ্বালাতে এসেছিল। ওর জানালার বাইরে একটা পদ্য আওড়াচ্ছিল।

—কন কী? পইদ্য। কিন্তু খবরে তা-ও তো লেখে নাই।

—পদ্যটা সুপরিচিত। 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? সে-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।' পাগল একসময় যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করত কিনা বলা যায় না।

হালদারমশাই খুব অবাক হয়ে বললেন—খবরে তো এসব কিছুই নাই।

বললাম—ব্যাকগ্রাউণ্ডটা কর্নেলের যখন জানা, তখন বোঝা যাচ্ছে আমার কথাই ঠিক। এই কেসে রহস্য আছে। বিজ্ঞাপন এবং খবরের ঘটনার মধ্যেও লিংক আছে। তার চেয়ে বড় কথা, অলরেডি কোনও পক্ষ কর্নেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সম্ভবত খবরটা কাগজে বেরুনোর আগেই। তাই না কর্নেল?

কর্নেল হাসলেন।—দ্যাটস রাইট, ডার্লিং! তবে বিজ্ঞাপনের পাগল এবং পদ্য আওড়ানো পাগল এক কি-না আমি জানি না। দুটার মধ্যে লিংকের কথা বলছ। সে-বিষয়ে আমি এখনও সিওর নই। এমন-কি, অমরেশ রায়ের মাথায় সেই পাগলই আঘাত করেছে কিনা তা-ও এ মুহূর্তে বলা কঠিন। অবশ্য ওঁর বডির পাশে রক্তমাখা একটা ছড়ি পাওয়া গেছে। ছড়িটা কিন্তু অমরেশবাবুরই। ওঁর মেয়ে এবং স্ত্রী ওটা সনাক্ত করেছেন।

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে বললেন—পাগল ছড়ি কাইড়্যা লইয়া ওনারে মারছে।

—ছড়ির ঘায়ে মাথার খুলিতে এক ইঞ্চি ডিপ ক্র্যাক হতে পারে না হালদারমশাই।

প্রাইভেট গোয়েন্দা চিন্তিত মুখে বললেন—পাগলের হাতে লোহার রড ছিল। তাড়া খাইয়া কোনও খানে পিক আপ করছিল। পাগলের কারবার!

কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিয়ে বললেন—অমরেশ বাবুর ছড়িতে রক্ত মাখানো ছিল। কেন? এটা একটা ভাইটাল প্রশ্ন, জয়ন্ত! ওঁর মাথায় যে-ই আঘাত করুক, সে সম্ভবত বোকামি করে ফেলেছে। রক্ত ছড়িতে কেন মাখাতে গেল?

হালদারমশাই মাথা নেড়ে বললেন—সেয়ানা পাগল! তারই কাজ। আমার মতে, কোনও পাগলই পুরা পাগল না, কর্নেল স্যার! আপনি কখনও কোন পাগলেরে গাড়িচাপা পড়তে ছ্যাখছেন?

কর্নেল অট্টহাসি হেসে সোজা হয়ে বসলেন।—দারুণ বলেছেন তো। সত্যি কোনও পাগল কখনও রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে মরেছে বলে শুনিনি। অথচ দেখা যায়, কত পাগল রাস্তায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তা পার হচ্ছে অকুতোভয়ে। তবে হ্যাঁ হালদারমশাই, পাগলেরও মৃত্যুভয় আছে। ভূতের ভয় আছে কিনা অবশ্য জানি না। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

—যাই গিয়া! বলে হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

বললাম—আপনি কি পাগলের ভূতের ভয় আছে কিনা পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন?

হালদারমশাই খি খি করে হেসে বললেন—কী যে কন! চলি কর্নেল স্যার।

উনি বেরিয়ে গেলে বললাম—মনে হচ্ছে, হালদারমশাই এই রহস্যের পেছনে দৌড়লেন। ওঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির অবস্থা নাকি শোচনীয়। কেস-টেসের খুব আকাল পড়েছে।

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিলেন। —হ্যাঁ, বলো ডার্লিং···কী ? ··কোথায় ? গড়িয়া ? বলো কী ! পাগলা এবং সেই পদ্য ?···আশ্চর্য ! তুমি এসো। আমি আছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এসো।

কর্নেল ফোন রেখে বললেন—আবার একটা ডেডবডি। হুবহু একই ঘটনা। রাতদুপুরে এক পাগলের জ্বালাতন এবং তাকে তাড়া করে যাওয়া। তারপর সকালে একটা ডোবার পাড়ে ডেডবডি। তবে প্রথম ঘটনায় মৃত ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা আছেন। দ্বিতীয় ঘটনায় মৃতের কেউ নেই। ভদ্রলোকের নাম পরিতোষ লাহিড়ি। আমার মতোই বুড়ো ব্যাচেলার।

কর্নেল আবার সেই বইটা খুলে বসলেন। এবার মলাটে আমার চোখ পড়ল। 'বাংলার আগস্ট বিপ্লব।' আমি ভেবেছিলাম অর্কিড. ক্যাকটাস কিংবা পাখি-প্রজাপতি সংক্রান্ত কোনও বই। আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু এসব ছেড়ে ১৯৪২ সালের 'আগস্ট বিপ্লবে' হঠাৎ আগ্রহী হয়ে পড়লেন কেন, চিন্তাযোগ্য বিষয় বটে। বার দুই প্রশ্নটা তুললাম। কিন্তু কোনও জবাব পেলাম না। অগত্যা সেই পাগলের বিজ্ঞাপনে মন দিলাম।

না, হালদারমশাই বর্ণিত 'পাগলাগারদ' থেকে নয়, এক পাগল পালিয়েছে কুমারচক উন্মাদ আশ্রম থেকে। বয়স প্রায় ৬৪-৬৫ বছর। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুট। বিশেষ লক্ষণ : নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, 'বরকধঝ-কচতটপ।' সাংঘাতিক বিপজ্জনক পাগল নাকি।

ছবিটা দেখে কিন্তু কিছু বোঝা যায় না। আপাতদৃষ্টে চমৎকার সভ্যভব্য চেহারা। সিঁথিকরা চুল। গায়ে হাফসার্ট। পকেটে কলম। শুধু চোখ দুটি কেমন যেন ক্রুর। নাকি আমারই চোখের ভুল ?

একটু পরে বললাম—আচ্ছা কর্নেল, কোনও পাগল সাংঘাতিক বিপজ্জনক হলে তো তার হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হয়। বিজ্ঞাপনে তেমন কিছু বলা হয়নি।

—হুঁ।

—কুমারচক কোথায় জানেন?

কর্নেল বই থেকে মুখ তুলে একটু হেসে বললেন—তুমি কুমারচকে গেলে তোমাদের কাগজের জন্য একটা স্টোরি পেতেও পারো। যাবে নাকি?

—নাহ। জায়গাটা কোথায়?

—ঠিকানা তো লেখাই আছে বিজ্ঞাপনে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—কুমারচক, জেলা নদীয়া লেখা আছে। কিন্তু লোকেশনটা কোথায়?

কর্নেল আঙুল তুলে বইয়ের একটা র‍্যাক দেখালেন—ওখানে ওমালি সায়েবের জেলা-গেজেটিয়ার আছে কয়েক ভল্যুম। আগ্রহ থাকলে খুঁজে বের করো। ঐতিহাসিক তথ্যও পেয়ে যাবে।

দ্রুত বললাম—থাক্। ওসব পোকায় কাটা সেকেলে বই দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁকলেন—যষ্ঠী।

ডিটেকটিভ দফতরের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ী এসে আমাকে দেখে কপট ভ্রূভঙ্গি করলেন।—সর্বনাশ। গাছে না চড়তেই এক কাঁদি? আপনারা কাগজের লোকেরা কি বাতাসে খবরের গন্ধ পান মশাই?

আমিও কপট গাম্ভীর্যে বললাম—মিঃ লাহিড়ী! আজ রোববার। আমার ফ্রেণ্ড-ফিলসফার-গাইডের কাছে আড্ডা দেওয়ার দিন।

অরিজিৎ হাসতে হাসতে বললেন—সরি! ভুলে গিয়েছিলাম।

কর্নেল বই রেখে ঘুরে বসলেন।—যাই হোক, গড়িয়ায় কোনও ডোবার ধারে পাওয়া আবার একটা ডেডবডির ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানোর নিশ্চয় কোনও কারণ আছে অরিজিৎ? এবারেও পুলিশের টপ র‍্যাংকের টনক নড়াল কে? কাল তুমি খুলে কিছু বলোনি। আমিও বিশেষ মাথা ঘামাইনি। আজ আমার খটকা লাগছে।

অরিজিৎ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—প্রথম ভিকটিম অমরেশ

রায় ছিলেন এক মন্ত্রীর পলিটিক্যাল লাইফের সহকর্মী। সেকেণ্ড ভিকটিম পরিতোষ লাহিড়ি—না, আমার কোনও আত্মীয় নন, কিংবা বারেন্দ্র বামুন-ফ্যাক্টরও কোনও ব্যাপার নয়—একই মন্ত্রীর বন্ধু। মানে, দুজনেই একসময় মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে ইংরেজতাড়ানো রাজনীতি করেছেন এবং জেল খেটেছেন।

না বলে পারলাম না—কী আশ্চর্য! সেইজন্য কর্নেল ওই বইটা নিয়ে মেতে আছেন?

—মেতে আছি মানে? কর্নেল সকৌতুকে বললেন।—মত্ততা পাগলেরও লক্ষণ। জয়ন্ত মাঝে মাঝে আমাকে পাগল সাব্যস্ত করার তালে থাকে। এবং ষষ্ঠীও।

ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে নিয়ে ঢুকছিল। থমকে দাঁড়াল। তারপর কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে সে গম্ভীর মুখে ট্রে রেখে চলে গেল। কফি খেতে খেতে অরিজিৎ ঘটনার বিবরণ দিলেন। পরিতোষ লাহিড়ির বয়স আটষট্টি বছর। একটা দোতলা বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। স্বপাক খেতেন। পাশের ঘরের ভাড়াটে এক নার্স মহিলা। গতরাতে তাঁর নাইট ডিউটি ছিল হাসপাতালে। ওপরতলায় থাকেন বাড়ির মালিক সপরিবারে। তাঁর নাম হরিপদ সেনগুপ্ত। অবসারপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার। অনিদ্রার রোগী। কিন্তু ঘুমের ওষুধ খেতে ভয় পান। শেষ রাতে ঘুম আসে। অনেক বেলা অব্দি বিছানায় থাকেন। তিনিই শুনেছিলেন, নিচে কে বিকট চেঁচিয়ে পদ্য আওড়াচ্ছে। একটু পরে পরিতোষবাবুর ধমক শুনে হরিপদবাবু জানালায় উঁকি মারেন। এরিয়ায় তখন লোডশেডিং ছিল। উনি টর্চের আলো ফেলে দেখেন, পরিতোষবাবু ছড়ি উঁচিয়ে এক পাগলকে তাড়া করে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা হাস্যকর। তবে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাননি হরিপদবাবু। ভোরবেলা খানিকটা দূরে রেললাইনের কাছে ডোবার ধারে পরিতোষবাবুকে পড়ে থাকতে দেখে এক অবাঙালি ধোপা। সে ওঁকে চিনত। সে হরিপদবাবুর বাড়িতে খবর দেয়।

অরিজিৎ বললেন—এরিয়ার কয়েকজন পাগলকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হরিপদবাবু সনাক্ত করতে পারেন নি। তাদের পদ্য বলতে বলেন ওসি। কেউ কিছু বলেনি। এমন কি, বিচক্ষণ ওসি নিজেই সেই পদ্যটা আওড়ে রিঅ্যাকশন যাচাই করেছেন। ওরা কেউ সাড়া দেয়নি। কাজেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—হরিপদবাবু কি জানতেন মন্ত্রীর সঙ্গে পরিতোষবাবুর চেনাজানা আছে?

—নাহ্, পরিতোষবাবুর একটা ডায়েরিতে নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা ছিল। মন্ত্রীমশাইয়ের কয়েকটা চিঠিও পাওয়া গেছে। বাই দা বাই, পরিতোষবাবু স্বাধীনতাসংগ্রামীদের পেনশন পেতেন। এসব কারণে ওসি মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে ফোন করেন। তারপর কী হয়েছে, বুঝতেই পারছেন। মন্ত্রীমশাই আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পরপর ওঁর দুজন 'সহযোদ্ধা' খুন। 'সহযোদ্ধা' কথাটা ওঁর।

আমি খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বিজ্ঞাপনটার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। কর্নেল আমার হাত থেকে কাগজটা প্রায় কেড়ে নিয়ে তিন নম্বর পাতা খুললেন। বললেন—প্রথম খুন শুক্রবার রাতে। দ্বিতীয় খুন শনিবার রাতে। প্রথমটা উত্তরে, দ্বিতীয়টা দক্ষিণে। তো অরিজিৎ, কাল তোমাকে বলেছিলাম। উত্তরের সন্দেহভাজন পাগলদের ধরে জেরা করা দরকার। আজ অবশ্য দক্ষিণেব সন্দেহ-ভাজন পাগলদের পেছনে দৌড়ুতে বলব না।

অরিজিৎ হাসলেন—গ্রেটার কলকাতায় পাগলের সংখ্যা লাখ-খানেক হতেই পারে। মানে ছাড়া-পাগলদের কথা বলছি। আবার দেখুন প্রতিদিনই কত পাগল মেন্টাল হসপিটাল বা লুনাটিক অ্যাসাইলামে ভর্তি হচ্ছে। তবে আমাদের লোকেরা বসে নেই জানবেন। সেই পদ্যপাগলকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্যত্র। আপনাকে কালই বলেছি, আমার

সন্দেহ কেউ রাত্রিবেলা লোডশেডিংয়ের সুযোগে ওই পদ্যপাগলকে লেলিয়ে দিয়ে ভিকটিমকে বাড়ির বাইরে এনেছে এবং খুন করেছে। তাছাড়া একটা ভাইটাল প্রশ্ন : ওই পদ্যটা শুনেই বা কেন ভিকটিম তাকে তাড়া করছে ?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। তুমি বুদ্ধিমানের মতো একটা পয়েন্ট খুঁজে বের করেছ ডার্লিং। ওই পদ্যে কি কোনও পুরনো গোপন ঘটনার সূত্র লুকিয়ে আছে ? কর্নেল খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ড্রয়ারে ঢোকালেন। তারপর বললেন—মন্ত্রীমশাই ব্যাপারটা জেনেছেন কি ?

—হ্যাঁ। ডিটেলস জেনে নিয়েছেন।

—পদ্যটা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেন নি ?

—নাহ্। তবে কথাটা শোনার পর ওঁকে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমার ঘাড়ে কটা মুণ্ডু যে ওঁকে জেরা করি ? অরিজিৎ দ্রুত কফি শেষ করে আস্তে বললেন—এখানেই সমস্যা। এজন্যই আপনার হেল্‌প চেয়েছি।

বললাম—মন্ত্রী ভদ্রলোক কে ?

—প্রতাপকুমার সিংহ।

—তাই বলুন ! উনি সঙ্গে একদঙ্গল আর্মড, গার্ড নিয়ে ঘোরেন বলে কাগজে খুব ঠাট্টাতামাসা করা হয়। ওঁর বাড়িও নাকি সারাক্ষণ পাহারা দেয় আপনাদের লোকেরা। এ নিয়ে বহুবার কার্টুন আঁকাও হয়েছে কাগজে। এখন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা ওঁর ক্ষমতার দম্ভ নয়—সম্ভবত আত্মরক্ষার ব্যূহ।

অরিজিৎ সায় দিয়ে বললেন—দ্যাটস রাইট। গত বছর দিল্লিতে ওঁকে মার্ডারের অ্যাটেম্পট্ হয়েছিল। গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল কেউ। তাকে ধরা যায়নি। কর্নেল। পদ্যের রহস্যভেদ করুন আপনি। আমি উঠি।

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি উঠে দাঁড়ালে কর্নেল বললেন—তোমাদের লোকেরা সর্বত্র সন্দেহভাজন পাগলদের দিকে নজর রেখেছে। নিশ্চয় সেই পদ্যটা আওড়ে পাগলদের রিঅ্যাকশন যাচাই

করাও হচ্ছে। তো আমি বলি, রিঅ্যাকশন যাচাই করতে বরং 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' আওড়ানোর নির্দেশ দাও।

অরিজিৎ হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

কর্নেল বললেন—জাস্ট আ মিনিট। এই পদ্যেও কোনও সাড়া না পেলে তোমাদের লোককে 'বরকধঝ-কচতটপ' আওড়াতে বলো। দেখ কী হয়!

অরিজিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

—হোয়াটস দ্যাট, কর্নেল?

—দ্যাটস দ্যাট, ডার্লিং! 'বরকধঝ-কচতটপ'। ভুলো না!

—ওঃ কর্নেল! আমার জোকের মুড নেই! বলে পুলিশের গোয়েন্দাকর্তা বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—বিজ্ঞাপনটার দিকে পুলিশের চোখ পড়েনি। তুমি মাঝে মাঝে বড় অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ো জয়ন্ত! তুমি অরিজিৎকে ওটা দেখালে রেডিও মেসেজ চলে যেত কুমারচকে। সেখানকার উন্মাদ আশ্রমে পুলিশ গিয়ে জেরায় জেরবার করত। এই হত্যারহস্যের সঙ্গে যদি দৈবাৎ ওখানে কোনও যোগসূত্র থাকে, তা ছিঁড়ে যেত। কারণ সংশ্লিষ্ট পক্ষ সাবধান হয়ে যেত।

—কিন্তু পুলিশের ওটা চোখে পড়া উচিত ছিল।

—ভুলে যেও না, পুলিশেও ব্যুরোক্রেসি অর্থাৎ আমলাতন্ত্র আছে। এক দফতরের সঙ্গে অন্য দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। এ সবই তোমার জানা কথা। তুমি নিউজম্যান।

কর্নেল সেই বইটা আবার হাতে নিলে বললাম—চলি।

—নাহ্। একমিনিট বসো। এই পাতাটা শেষ করে নিয়েই বেরুব।

—কোথায়?

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। হঠাৎ নড়ে উঠলেন।—কী আশ্চর্য! বলে বইটার পাতা ওল্টাতে থাকলেন ব্যস্তভাবে।—নাহ্। ফর্মার গণ্ডগোল নয়। কর্নেল দুই পাতার মাঝখানে সেলাইয়ের

জায়গা আতস কাচে পরীক্ষা করলেন। তারপর শ্বাস ছেড়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। একটা চুরুট ধরিয়ে আবার বললেন—কী আশ্চর্য!

—আশ্চর্যটা কী, খুলে বলবেন?

—একটা পাতা নেই। ১৩৩ পৃষ্ঠা আর ১৩৪ পৃষ্ঠা।

—কী ছিল ওতে?

—একটা রোমাঞ্চকর বিবরণ। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটা মিলিটারি ট্রেন আসছে। কজন বিপ্লবী নদীর ব্রিজে লাইনের ফিস-প্লেট সরিয়ে একটু দূরে ঝোপঝাড়ের ভেতর ওত পেতে আছেন। যথাসময়ে ট্রেনটা এসেই ব্রিজ ভেঙে গড়িয়ে পড়ল নদীতে। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বিকট শব্দ, ইঞ্জিনের আগুনের ঝলকানি, আর্তনাদ। এর পর লেখক লিখেছেন 'আমরা তৎকালে যেন এক অন্ধ শক্তির বশীভূত ছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল গার্ডের কামরায় সংলগ্ন মালবাহী ভ্যান। টর্চের আলোয় সেই ভ্যান অন্বেষণে ছুটিয়া—ব্যস! এখানেই ১৩২ পৃষ্ঠা শেষ। ১৩৫ পৃষ্ঠায় দশম পরিচ্ছেদ।

—বইটা কোথায় পেলেন?

—অনেকদিন আগে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে কিনেছিলাম। তুমি তো জানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি একজন তরুণ আর্মি অফিসার ছিলাম। বর্মা থেকে গিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় থাকার সময় বেঙ্গলে আগস্টবিপ্লবের খবর পেয়েছিলাম। এ বয়স অব্দি ঘটনাটা আমাকে হন্ট্ করে। কারণ বাঙালি বিপ্লবীরা কোথাও কোথাও ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গেও লড়তে নেমেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার একটা বিশাল অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। দীঘা যাওয়ার পথে কাঁথি পেরিয়ে সম্ভবত রামনগরের কাছাকাছি একটা ক্যানেলের ধারে ব্রিটিশ সৈনিকদের একটা স্মৃতিস্তম্ভ দেখেছিলাম। জানি না সেটা এখন আছে কিনা। ওরা আগস্টবিপ্লব দমনে গিয়ে মারা পড়েছিল। সম্ভবত সমুদ্রের বন্যায়। সেটা ১৯৪২ সাল। সেবার ওই অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড়ের সময় সমুদ্র ২২ মাইল ছুটে এসেছিল।

কর্নেলের মুখে উত্তেজনার ছাপ পড়েছিল। বললাম—বুঝলাম। কিন্তু এতদিন বুঝি বইটা পড়েন নি?

—জাস্ট, পাতা উল্টেছিলাম বলতে পারো। বড্ড বেশি ভাবোচ্ছ্বাস আর বাগাড়ম্বর।

—হঠাৎ আজ সকাল থেকে এটা খুঁটিয়ে পড়ার কারণ অনুমান করতে পারছি। তুই আগস্টবিপ্লবীর হত্যাকাণ্ড। বইটা কার লেখা?

—অমরেশ রায়ের।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁঃ। বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—পরিতোষ লাহিড়ির ডেরায় যাব ভেবেছিলাম। বাড়ির মালিক হরিপদবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। কিন্তু বইয়ের একটা পাতা হারানো কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। কাজেই চলো, অমরেশবাবুর বাড়িই যাওয়া যাক। নিশ্চয় ওঁর বাড়িতে বইটার কপি পাওয়া যাবে। নিজের লেখা এবং নিজের পয়সায় ছাপানো বই। এক মিনিট। পোশাক বদলে নিই।

ঘড়ি দেখলাম। সওয়া দশটা বাজে। কোনও পাগলের পাল্লায় পড়লে নিষ্কৃতি মিলতে পারে। কিন্তু এই বৃদ্ধ রহস্যভেদীর পাল্লায় পড়লে কী অবস্থা হয়, হাড়ে-হাড়ে জানি।···

দুই

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ধারে একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। এলাকায় প্রমোটারদের নজর পড়েছে, তার লক্ষণ এখানে-ওখানে দেখতে পাচ্ছিলাম। ডোবা, খানাখন্দ, ঝোপঝাড়ের ফাঁকে নির্মীয়মান বাড়ি এবং চাপা যান্ত্রিক কলরব। পেছনে একটা বস্তি। কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল একটি মেয়ে। মুখ থেকে এখনও কিশোরীর

আদল মুছে যায়নি। ছিপছিপে গড়ন। লাবণ্য আছে। কিন্তু দেখামাত্র বোঝা যায় ওই লাবণ্যে ঘন বিষাদের ছায়া পড়েছে। অনুমান করলাম, আঠারোর মধ্যে বয়স।

সে আস্তে বলল—কাকে চাই?

কর্নেল বললেন—এটা কি অমরেশ রায়ের বাড়ি?

মেয়েটি শুধু মাথা দোলাল। বিষণ্ণ চোখে কৌতূহলের চাঞ্চল্য ফুটে উঠল। সম্ভবত কর্নেলের পাদ্রীসুলভ চেহারাই তার কারণ।

—আজকের কাগজে খবরটা পড়ে খুব মর্মাহত হলাম। তুমি কি ওঁর মেয়ে?

—হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তোমার বাবার সঙ্গে একসময় আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাকে বহুবার বলেছেন আসতে। সময় করে উঠতে পারিনি। তবে উনি প্রায়ই যেতেন আমার কাছে। তো হঠাৎ আজ কাগজে সাংঘাতিক খবরটা পড়ে চমকে উঠেছিলাম। তাই ভাবলাম একবার যাওয়া উচিত। তোমার নাম কী মা?

—নন্দিনী।

—নন্দিনী, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলে যেতে চাই।

নন্দিনী আস্তে বলল—মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন।

—ও! তাহলে তো তুমি এতটুকু মেয়ে বড্ড বিপদে পড়ে গেছ। বাড়িতে আর কে আছে?

—পাশের বাড়ির জেঠিমারা আছেন। অসুবিধা হচ্ছে না।

—আলাপ করিয়ে দিই। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। ওকে সঙ্গে নিয়ে এলাম, তোমাদের কাছে ডিটেলস জেনে নিয়ে কাগজে ফ্ল্যাশ করবে। তাহলে পুলিশের ওপরতলার টনক নড়বে। বোঝো তো, আজকাল যা অবস্থা। চাপে না পড়লে

পুলিস কিছু করে না।

নন্দিনী একটু ইতস্তত করে বলল—মিনিস্টার প্রতাপ সিনহা বাবাকে চেনেন। কাল দুপুরে ওঁকে ফোন করেছিলাম পাশের বাড়ি থেকে। পুলিশ থেকে ডি সি, এ সি—সবাই এসেছিলেন। একটু আগেও—

—বাহ্। তাহলে তো ভালই। মিনিস্টারের ফোন নম্বর তুমি জানতে ভাগ্যিস।

—বাবার নোটবইয়ে লেখা ছিল।

—তুমি বুদ্ধিমতী নন্দিনী। কর্নেল টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন—মনে পড়ছে, অমরেশবাবু বলেছিলেন, উনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। আগস্টবিপ্লব নিয়ে একটা বইও নাকি লিখেছিলেন। আমাকে দেবেন বলেছিলেন।

পেছন থেকে এক প্রবীণ মহিলা উঁকি দিলেন—আপনারা কি লালবাজার থেকে আসছেন?

নন্দিনী কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন—না। অমরেশবাবু আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আজ কাগজে ওর মৃত্যুর খবর পড়ে ছুটে এসেছি। আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আর এ হলো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। একে সঙ্গে এনেছিলাম, কাগজে আরও লিখে যদি এই সাংঘাতিক মার্ডারের তদন্ত ভালভাবে হয়।

ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে বললেন—খুকু। বসার ঘরের দরজা খুলে দাও। কাগজে ভাল করে ছাপা হলে সত্যিকার কাজ হবে। পারুর বাবা বলছিলেন, মিনিস্টার হাজারটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পুলিশ দায়সারা কাজ করে কেটে পড়বে। পাগলের কাজই যদি হয়, এখনও ধরতে পারল না কেন? এই তো বঙ্কার মা বলল, ওদের বস্তিতে একজন পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা ও ঘরে গিয়ে বসুন। একটু কড়া করে লিখবেন যেন।

নন্দিনী ভেতরে চলে গিয়েছিল। পাশের একটা ঘরের দরজা

খুলে সে ডাকল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি রাস্তা থেকে উঠে গেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, আলমারি ভর্তি বই। একপাশে সাধারণ সোফাসেট। কোণার দিকে একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার। দেয়ালে প্রখ্যাত দেশনেতাদের ছবি টাঙানো।

ভদ্রমহিলা পর্দা তুলে উঁকি মেরে বললেন—খুকু। যা যা হয়েছে, সব বলবে। আমি চা পাঠাচ্ছি। আর শোনো। প্রথমে পুলিশ গা করেনি, তাও বলবে। পারুর বাবা মিনিস্টারের কথা না তুললে তুমিও তো কিছু জানতে না। হোমরা-চোমরা অফিসাররাও ছুটে আসতেন না।

উনি অদৃশ্য হলে কর্নেল বললেন—বসো নন্দিনী।

নন্দিনী কুণ্ঠিতভাবে একটু তফাতে বসল। বলল—বাবাকে আগের রাতেও পাগলটা খুব জ্বালিয়েছিল।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত। তুমি নোট করে যাও। নন্দিনীর সব কথা ডিটেলস নোট করো।

আমার সঙ্গে রিপোর্টারস্ নোটবুক সবসময় থাকে। বিরক্তি চেপে সেটা বের করে ডটপেন বাগিয়ে ধরে বললাম—বলো। সরি! বলুন।

নন্দিনী বলল—আমাকে তুমি বলতে পারেন।

—ওক্কে! বলো।

নন্দিনীর কণ্ঠস্বর শান্ত ও বিষণ্ণ। কিন্তু প্রথম যৌবনের উত্তাপ হয়তো মেয়েদের কী এক স্পর্ধিত সাহসও দেয়। সে একটু পরে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

ততক্ষণে কর্নেল আলমারির বই দেখতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনটে পুরনো আলমারি ইংরেজি বাংলা বই আর বাঁধানো পত্রিকায় ঠাসা। কর্নেল তন্নতন্ন করে দেখছেন। ঝুঁকে পড়ছেন। কখনও হাঁটু দুমড়ে বসছেন। নন্দিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে সে রাতের কথা বলে যাচ্ছে। সে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরে ঘুম ভেঙে বাবার কথা মনে পড়ে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে, তখনও তার

'বাবা ফেরেনি। সে সদর দরজা খুলে রাস্তায় যায়। সেইসময় তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে বঙ্কার মা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়, এইমাত্র বস্তির কে তার বাবাকে খালের ধারে পড়ে থাকতে দেখেছে। মাথায় চাপ-চাপ রক্ত।

নন্দিনীর কণ্ঠস্বর এতক্ষণে কেঁপে গেল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। কর্নেল বললেন—দ্যাটস এনাফ। মন শক্ত করো নন্দিনী।

কর্নেল এসে সোফায় বসলেন—তোমার বাবার কালেকশন মূল্যবান। বহু দুষ্প্রাপ্য বই আছে। কিন্তু ওঁর লেখা 'বাংলার আগস্ট-বিপ্লব' তো দেখলাম না।

নন্দিনী চোখ বড় করে তাকাল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—কদিন আগে বাবা বইটা খুঁজছিল। একটামাত্র কপি ছিল। নেই। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, কাকেও পড়তে দিয়েছি নাকি। আমি বাবার বইটা দেখিনি। মাকে জিজ্ঞেস করছিল। মা-ও জানে না কিছু। বাবা তন্নতন্ন খুঁজে বইটা পায়নি। শেষে স্কুলের লাইব্রেরিতে গেল। লাইব্রেরিতে নাকি একটা কপি ছিল। পাওয়া যায়নি। বাবা বলছিল, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!

—তোমার বাবার কাছে নিশ্চয় অনেকে দেখা করতে বা আড্ডা দিতে আসতেন?

—হ্যাঁ। বাবা ফ্রিডম-ফাইটার ছিল। ফ্রিডম-ফ্রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন গতবার সভা করে বাবাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। তাঁরা আসতেন। আমি কাকেও চিনি না। অ্যাড্রেসও জানি না। বাবার নোটবইয়ে থাকতে পারে।

কর্নেল গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন—জয়ন্ত! এই বইহারানো পয়েন্টটাও নোট করে নাও। নন্দিনী, তোমার বাবার নোটবইটি নিয়ে এসো। অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে যোগাযোগ করবে জয়ন্ত।

নন্দিনী উঠে গেল। আমি কথা বলতে যাচ্ছি, কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে নিষেধ করলেন। চায়ের ট্রে নিয়ে সম্ভবত বঙ্কার মা

ঢুকল। সেই প্রবীণ মহিলা উঁকি মেরে দেখে বললেন—খুকু কোথায় গেল?

কর্নেল বললেন—পাশের ঘরে।

মহিলা অদৃশ্য হলেন। বংকার মাও চলে গেল। চা খেতে খেতে নন্দিনী একটা কালো মোটা নোটবই নিয়ে ফিরে এল। কর্নেল নোটবইটা তার হাত থেকে টেনে নিলেন। পাতা ওল্টাতে থাকলেন। একটু পরে বললেন—জয়ন্ত। লেখো, ১১৭ বি নকুল মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-৫।

আমি লিখলাম। কর্নেল চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন—সর্বনাশ আমি তো চায়ে চিনি খাই না। থাক্।

নন্দিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চিনিছাড়া চা এনে দিচ্ছি। একটু বসুন!

সে চলে গেলে কর্নেল একটা কাণ্ড করে বসলেন। নোটবই থেকে একটা পাতা সাবধানে ছিঁড়ে দ্রুত ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালেন। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

নন্দিনী ফিরে এসে বসলে কর্নেল পাতা উল্টে বললেন—পরিতোষ লাহিড়ির ঠিকানা আছে দেখছি। আমি ভদ্রলোককে চিনি। অমরেশবাবুর সঙ্গে একবার আমার কাছে গিয়েছিলেন। নন্দিনী কি পরিতোষবাবুকে চেনো?

নন্দিনী একটু ভেবে নিয়ে বলল—নামটা চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গত সোমবার—না, মঙ্গলবার এসেছিলেন। কোথায় একটা মিটিং হবে। বাবাকে বলতে এসেছিলেন। বাবার যাওয়ার কথা ছিল। আজই তো ডেট ছিল। আজ রোববার।

—কোথায় মিটিং হওয়ার কথা মনে পড়ছে? জয়ন্ত, নোট করে।

নন্দিনী স্মরণ করার চেষ্টা করছিল। বলল—কলকাতার বাইরে কোথায় যেন। নোট বইয়ের টোকা থাকতে পারে। বাবা সব লিখে রাখত।

কর্নেল পাতা উল্টে খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। বংকার মা চিনিছাড়া

চা দিয়ে গেল। কর্নেল সেই চায়ে দিব্যি চুমুক দিলেন। সত্যি বলতে কি, চা আমি অনেক কষ্টে গিলেছি। নন্দিনীদের চা নন্দিনীর মতো নয়। ঠিক বংকার মায়ের মতোই। কথাটা আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে ফেরার সময় বলতে হবে।

নন্দিনী বলল—পেলেন না? আমাকে দিন তো।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। নোটবইটা ওর হাতে দিয়ে বললেন—থ্যাংকস নন্দিনী। অ্যাসোসিয়েশন অফিস থেকে জেনে নেবে জয়ন্ত। চলি। আর শোনো, মাকে আমার কথা বোলো। ভেঙে পড়ো না। শক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াও। আমার নামটা মনে থাকবে তো? কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। বলে পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দিলেন।—কিছু ঘটলে মিনিস্টারকে ফোন করার আগে আমাকে ফোন করে জানাবে।

নন্দিনী কার্ডে চোখ বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে হলো, মেয়েটি বড় সরল আর নিষ্পাপ। কর্নেল ওর সঙ্গে ছলনা না করে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেই পারতেন। হয়তো ও তাতে সাহস পেত মনে। হয়তো কোনও গোপন কথা বলার ছিল, বলল না—কর্নেলের পরিচয় পেলে তা খুলে বলত। কর্নেলের নোটবইয়ের পাতা চুরির দরকারই হতো না। কিন্তু কর্নেল কেন সে-পথে গেলেন না?

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ঘোরানোর সময় দেখলাম, কালো নোটবই হাতে নিয়ে নন্দিনী বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

ভি আই পি রোডে পৌঁছুনো অব্দি কর্নেল চোখ বুজে ধ্যানস্থ ছিলেন। এতক্ষণে চোখ খুলে বললেন—'ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? সে-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।' দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, ডার্লিং!

—কিসের?

—এই রহস্যের। কল্পনা করো জয়ন্ত! এই জুন মাসের রাত-দুপুরে লোডশেডিংয়ের সময় তোমার জানালার ধরে দাঁড়িয়ে কেউ

পদ্যটা জোর গলায় আওড়াচ্ছে। তুমি কী করবে?

—কিছু করব না। কারণ ধরেই নেব, লোকটা পাগল। পাগলের কথায় কান দিলে তার পাগলামি বেড়ে যাবে। কমন সেন্স!

—নাহ্। এখন তুমি ঘটনাটা জানো বলেই এ কথা বলছ। আচমকা ওই পাগলামি শুরু হলে অবশ্যই তুমি রেগে যাবে। তাকে ধমকাবে। তাড়া করতেও বেরুতে পারো। ভেবে বলো।

—হ্যাঁ। তবে তা-ই বলে তার পিছনে বেশিদূর দৌড়ুব না।

কর্নেল হাসলেন—এবার তুমি ঠিক বলেছ। বেশিদূর তাড়া করে তুমি যাবে না। এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত। অথচ লক্ষ্য করার মতো ঘটনা: অমরেশ প্রথম রাতে আসে। ধমক দেন। পাগল চলে যায়। দ্বিতীয় রাতে আসে। ধমক দেন। শেষে বেরিয়ে তাড়া করেন। প্রায় হাফ কিলোমিটার। এবার পরিতোষের প্রতিক্রিয়া দেখ। উনি শোনামাত্র বেরিয়ে পড়েন। তাড়া করে যান—সেও প্রায় একই দূরত্ব। পদ্যটার মধ্যে কি কোনও পুরনো তিক্ত স্মৃতি লুকিয়ে ছিল? কোনও সাংঘাতিক ঘটনার গোপন স্মৃতি? তবে অমরেশ পরিতোষের চেয়ে সহিষ্ণু। এটুকুই যা তফাত। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। দুজনকেই পাগল নিয়ে গেছে নির্জন জায়গার দিকে। খুনী সম্ভবত সেখানে ওত পেতে বসেছিল। পাগল তার ফাঁদ।

অবাক হয়ে বললাম—আগে তো কখনও এমন ঝটপট আপনাকে থিওরি দাঁড় করাতে দেখিনি। নোটবইটার চুরি করা পাতায় নিশ্চয় কোনও তথ্য পেয়ে গেছেন।

কর্নেল জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললেন—ছিঃ ডার্লিং। আমাকে প্রকারান্তরে চোর বোলো না! কাজটা যে-কোনও রহস্যে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে পড়ে।

—কী আছে তথ্যে?

—কুমারচক উন্মাদ আশ্রমের ঠিকানা এবং একটি নাম—শচীন্দ্র মজুমদার। আরও কিছু কথা।

চমকে উঠে বললাম—বলেন কী! কিন্তু সেই পলাতক পাগলের সঙ্গে এই কেসের কী সম্পর্ক! আমার মাথা ঘুরছে, বস্!

—সাবধান জয়ন্ত। অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে। বলে কর্নেল আবার চোখ বুজে হেলান দিলেন।

ইলিয়ট রোডের বাড়িতে কর্নেলকে পৌঁছে দিয়ে ইস্টার্ণ বাইপাস হয়ে সল্টলেকের ফ্ল্যাটে যখন ফিরলাম, তখন প্রায় একটা বাজে। সারাপথ পাগল খুঁজেছি। আশ্চর্য ব্যাপার, রোজই রাস্তাঘাটে কত পাগল দেখি, এদিন একটাও দেখলাম না। পুলিশ কি রাজ্যের সব পাগলকে থানায় নিয়ে গেছে? বলা যায় না। মিনিস্টারের কেস।

সেদিনই রাত দশটায় কর্নেলের ফোন পেলাম। বললেন—তুমি আসবে ভেবেছিলাম। এলে না। ভয় পাওনি তো?

অবাক হয়ে বললাম—ভয়? কিসের ভয়?

—পাগলের।

হাসি পেল।—পাগল কি আর কলকাতায় আছে? সবাইকেই সম্ভবত পুলিশে ধরেছে।

—'বরকধঝ-কচতটপ'কে ধরতে পারেনি। কিছুক্ষণ আগে শ্যামবাজারের একটা গলিতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার হাতে একটা ছোট্ট কিন্তু মোটাসোটা লোহার ডাণ্ডা ছিল।

—সর্বনাশ!

—নাহ্। খুব ভদ্র পাগল। শিক্ষিতও।

—কিন্তু হাতে লোহার ডাণ্ডা···

—ওর পেছনে কুকুর লাগে। তাই সে ওটা মেট্রোরেলের আবর্জনা থেকে সংগ্রহ করেছে। যাই হোক, ওকে ডিনারের নেমন্তন্ন করলাম। রাজীও হল। কিন্তু আমার গাড়ীতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ মত বদলাল। ফেলুবাবুর বাড়ি এ রাতে তার নাকি ডিনারের নেমন্তন্ন। ভুলে গিয়েছিল। ফেলুবাবুর আসল নাম সে বলতে পারল না। শুধু বলল, মিনিস্টার।

—ইন্টারেস্টিং! তারপর?

—দৌড়ে পালিয়ে গেল। ডার্লিং! এ বয়সে ছোটাছুটি, বিশেষ করে পাগলের পিছনে—আমাকে মানায় না।

—শ্যামবাজারের গলিতে কেন গিয়েছিলেন?

—সেই নকুল মিস্ত্রি লেন। ফ্রিডম-ফ্রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিস।

—তাই বলুন! বইটা পেলেন?

—নাহ্। বইটা ছিল। কিন্তু খুঁজে পেলেন না ওঁরা। ইস্যু-রেজিস্টার খুঁজেও হদিস মিলল না। দোতলায় অফিস। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই এক পাগলের মুখোমুখি হলাম। জিজ্ঞেস করলাম—'বরকধঝ-কচতটপ'? সবিনয়ে হেসে বলল—আজ্ঞে। তো আমার ডিনারের নেমন্তন্ন নাকচ করে সে পালিয়ে গেল। তখন আবার সেই অফিসে উঠে গেলাম। জিজ্ঞেস করে জানলাম, একজন পাগল কদিন থেকে ওঁদের অফিসে এসে জ্বালাতন করছে। সন্ধ্যার দিকে অফিস খোলে। তখন সে আসে। তাড়া খেয়ে নীচে সিঁড়ির ধাপে চুপচাপ বসে থাকে। ওঁরা কেউ তাকে চেনেন না। অথচ সে বলে, আমিও একজন ফ্রিডম-ফাইটার।

—লাহিড়িসায়েবকে জানিয়ে দিন।

—দিয়েছি। কিন্তু এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং খবর আছে, জয়ন্ত! তুমি এলে না। এলে খুব এনজয় করতে। সকালে এসো। বলব-খন। রাখছি।

—হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

—বলো।

—জাস্ট্ একটু হিন্ট্ দিন প্লিজ।

—হালদারমশাই সত্যিই কুমারচকে গিয়েছিলেন। রোমাঞ্চকর অভিযান বলা চলে। রাখছি।·····

লাইন কেটে গেল। এ একটা বিচ্ছিরি রাত। তালগোল পাকানো রহস্যের মতো নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি আবার। কতবার মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার বৃদ্ধ বন্ধুর সংসর্গ যত আনন্দদায়ক

হোক, ওঁর ওইসব বাতিকের সঙ্গে নিজেকে জড়াব না। শেষাবধি উনিই রহস্যের জট ছাড়াবেন এবং দৈনিক সত্যসেবকের জন্য চমৎকার একটা স্টোরি এমনি-এমনি তো পেয়ে যাব। কাজেই অকারণ আমার হন্যে হওয়ার মানে হয় না। অথচ রহস্য জিনিসটাই এমন এক চুম্বক, যা কাকেও নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না। নিজের দিকে টেনে নেয়। নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ে।

তা হলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কুমারচকে পাড়ি জমিয়েছিলেন? অনেক প্রাক্তন এবং বর্তমান পুলিশ অফিসার দেখেছি, এমন ছিটগ্রস্ত কাকেও দেখিনি। ওঁর অভিযান কী অর্থে রোমাঞ্চকর ভেবেই পেলাম না। অবশ্য উনি বড্ড হঠকারী এবং দুর্দান্ত বেপরোয়া এবং জেদি মানুষও বটে।

'ঘুম না এলে শক্ত বিষয়ের বই পড়ে দেখতে পারো।' আমার এক অভিজাত সাংবাদিক বন্ধুর উপদেশটা মনে পড়ল। ছাত্রজীবনে আঁতলামির নেশায় বাইশ টাকা দামে কেনা জঁা পল সাত্রে'র 'বিইং অ্যাণ্ড নাথিংনেস' গাব্দা বইটা চমৎকার কাজ দিয়েছে, সেটা সকালে বোঝা গেল অবশ্য। বইয়ের কথাগুলো চোখে ধাক্কা মেরেছে। মাথায় ঢোকেনি। কাজেই চোখ বেচারা কাহিল হয়ে বুজে গেছে।····

কর্নেলের তিনতলার ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, বৃদ্ধ রহস্যভেদী এখন প্রকৃতিরহস্যে বুঁদ হয়ে আছেন। একগোছা অর্কিড একটুকরো কাটা ডালে সাঁটা এবং সেটা টেবিলে রেখে উনি আতস কাচে কী সব দেখছেন। ইশারায় বসতে বললেন আমাকে।

একটু পরে উজ্জ্বল মুখে হাসলেন।—হালদারমশাইয়ের উপহার। সচরাচর এত সরু ডালে অর্কিড বাঁচে না। তবে বরাবর বলে আসছি ডার্লিং, প্রকৃতির রহস্য অন্তহীন। হালদারমশাই ডালটা মুচড়ে ভেঙে কষ্ট করে নিয়ে এসেছেন অত দূর থেকে। উনি জানেন, আমি অর্কিড ভালবাসি। তুমি একটু বসো। এটার সদ্‌গতি করে আসি।

কর্নেল তার ছাদের 'শূন্যোদ্যানে' চলে গেলেন। ষষ্ঠী ট্রে-তে

কফি আর স্ন্যাক্স এনে দিয়ে চাপা স্বরে বলল—হালদারমশাই কোথায় পাগলাগারদে ঢুকেছিলেন। কপালে হাতে-পায়ে পট্টি বাঁধা। আমার সন্দ, পাগলারা ওনাকে মেরেছে। মার খেয়ে গাছের ডগায় উঠে লুকিয়ে ছিলেন। ইংরিজিতে বলছিলেন তো। সব কথা বুঝতে পারিনি।

বললাম—কাল রাতে এসেছিলেন উনি?

—আজ্ঞে। বলছিলেন, কোনওরকমে পাইলে এসেছেন। বলেই ষষ্ঠী চলে গেল।

ড্রয়িংরুমের কোণা থেকে ছাদে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়িতে কর্নেলের পা দেখা যাচ্ছিল। নেমে এসে বাথরুমে ঢুকলেন। একটু পরে বেরিয়ে এলেন। ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরিয়ে প্রসন্নমুখে বললেন—কৃত্রিম পদ্ধতিতে অর্কিড চাষ সহজ নয়। এসব পরজীবী উদ্ভিদকে জ্যান্ত গাছের ডাল ছাড়া বাঁচানো কঠিন। তবে কাটা ডালে অর্কিডের খাদ্য যোগান দিলে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। সারারাত ডালটা জারে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। দেখা যাক।

বললাম—হালদারমশাই কুমারচকের উন্মাদ আশ্রমে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর পাগলাদের ধোলাই খেয়ে গাছে চড়েছিলেন। সেই গাছের ডালে অর্কিডটা ছিল। ইজ ইট?

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন।—ষষ্ঠীর বর্ণনা। হুঁ—কতকটা তাই। তবে পাগলারা তো বন্দী। ওঁকে চার্জ করেছিল গার্ডরা। দিনদুপুরে একটা লোক আশ্রমের দেয়ালের ওপর গাছে চড়ে বসে আছে, এটা সন্দেহজনক। এই অবস্থায় ওই অর্কিডটা ওঁকে বাঁচিয়ে দেয়। উনি নিজেকে বটানিস্ট, বলে পরিচয় দেন। অর্কিড সংগ্রহের হবির কথাও বলেন।

—ষষ্ঠী বলছিল, কপালে হাতে-পায়ে পট্টি বাঁধা।

—গাছের ডালের খোঁচায় ছড়ে গেছে। তাড়াহুড়ো নামতে

গিয়ে পড়েও গিয়েছিলেন। তবে গার্ডরা প্রথমে ওঁকে পাগল ভেবেছিল। ভাবতেই পারে।

হালদারমশাই বরাবর এ ধরনের অদ্ভুত বিভ্রাট বাধান দেখেছি। হাসতে হাসতে বললাম—সত্যিই রোমাঞ্চকর অভিযান বলা চলে। কিন্তু এতে লাভটা কী হলো?

—কিছুটা হয়েছে। উন্মাদ আশ্রমটা বেসরকারি, এটা জানা গেছে। তার সেক্রেটারির নাম শচীন্দ্র মজুমদার, তা-ও জানা গেছে। মিনিস্টার প্রতাপ সিংহমশাই আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক এবং সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেন। এমন কি, আন্তর্জাতিক সাহায্যও ওঁর চেষ্টায় পাওয়া যায়। হালদারমশাই কতগুলো তথ্য সংগ্রাম করে এনেছেন।

একটু অবাক হয়ে বললাম—শচীন্দ্র মজুমদারের নাম অমরেশবাবুর নোটবইয়ে লেখা ছিল না?

—হ্যাঁ। যে মিটিংয়ের কথা শুনেছিল নন্দিনী, সেটা ওখানেই হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে পিছিয়ে গেছে।

—অনিবার্য কারণ কি অমরেশবাবু এবং পরিতোষবাবুর মৃত্যু?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—শচীনবাবু বলেছেন, ম্যানেজিং কমিটির দুজন সদস্যের মৃত্যু। খুন-খারাপির কথা বলেন নি। বুদ্ধিমান হালদারমশাই ও-কথা তোলেন-ও নি।

পাগল সম্পর্কে বিজ্ঞাপনটার কথা তোলেননি হালদারমশাই?

—নাহ্। তবে শচীনবাবু নিজে থেকেই বলেছেন, আশ্রম থেকে একজন পাগল পালিয়ে গেছে। সে নাকি খুনে প্রকৃতির পাগল। একজনকে সাংঘাতিকভাবে জখম করেছিল। তখন তাকে নির্জন সেলে আটক রাখা হয়। হাতে-পায়ে ডাণ্ডাবেড়ির কথা ভাবা হয়েছিল। ডাণ্ডাবেড়ির অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় কামারশালায়। কিন্তু কী করে সে গরাদ বেঁকিয়ে পালিয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, তাকে কড়াডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। দুজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার ভলান্টারি সার্ভিস দেন। তাঁরাও কমিটির মেম্বার। কর্নেল চুরুট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে টেবিলের

ড্রয়ার থেকে একটা প্রচার-পুস্তিকা বের করলেন।—পড়ে দেখ। ইণ্টারেস্টিং।

চার পাতার চটি বইটায় চোখ বুলিয়ে জানতে পারলাম, ১৯৪২ সালে আগস্টবিপ্লবের সময় অনেক বিপ্লবী ধরা পড়েন। অনেকের ফাঁসি হয়। অনেকের দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়। স্বাধীনতার পরও অনেকে মুক্তি পান নি। কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ ছিল। আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতে এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের জটিলতায় তাঁদের মুক্তি পেতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে শারীরিক নির্যাতন আর মানসিক পীড়নে তাঁদের কেউ-কেউ বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। ছয়ের দশকের শেষাশেষি ফ্রিডম-ফাইটার্স অ্যাসো-সিয়েশনগুলো গড়ে ওঠে নানা জায়গায়। কুমারচকেও গড়ে ওঠে। উন্মাদ হয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের চিকিৎসা এবং আশ্রয়ের জন্য একটা আশ্রম গড়া হয়। জনা-সতের বিপ্লবীকে আশ্রমে আনা হয়েছিল। এখন তাঁরা বেঁচে নেই। কিন্তু আশ্রমটি তুলে দেওয়া হয়নি। সমাজসেবার স্বার্থে সাধারণ উন্মাদদের জন্য কাজ চলতে থাকে। এদিকে মন্ত্রী প্রতাপ সিংহের পৈতৃক বাড়ী কুমারচকে। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে 'স্বাধীনতাসংগ্রামী সেবাশ্রম' নামটা বদলে 'কুমারচক উন্মাদ আশ্রম' নাম রাখা হয়।

বইটা ফেরত দিয়ে বললাম—তা হলে গত রাতে আপনি 'বরকধঝ-কচতটপ'-এর দেখা পেয়েছিলেন এবং সে একটা ফ্রিডম-ফাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গিয়ে জ্বালাতন করে। কাজেই কুমারচক উন্মাদ আশ্রমের পলাতক পাগল একজন প্রাক্তন বিপ্লবী। রাইট?

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন—পসিব্‌লি!

—শচীনবাবুও কি প্রাক্তন বিপ্লবী?

—অবশ্যই।

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালাম। আজকাল সিগারেট কমিয়ে দিয়েছি কিন্তু যা বুঝছি রহস্যটা অতীব জটিল। তাই

সিগারেট জরুরি ছিল। বললাম—সেই হারানো বইটা আপনি ন্যাশান্যাল লাইব্রেরিতে খুঁজে দেখতে পারেন। ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠায় কী ছিল যে—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন—হয়তো বইটার আর দরকার হবে না। আমার কাছে ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের মিলিটারি সিক্রেট রেকর্ডস-সংক্রান্ত একটা বই আছে। ওতে দেখলাম, সেই বছর নদীয়া জেলায় অক্টোবর মাসের এক ঝড়বৃষ্টির রাত্রে একটা স্পেশাল মিলিটারি ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল। নাশকতা-মূলক কাজ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, বর্মা রণাঙ্গণ থেকে পালিয়ে আসার সময় রেঙ্গুন ব্রাঞ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে অনেক নগদ টাকা আর সোনাদানা এনে যশোর বিমানঘাঁটিতে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে সামরিক প্লেনে সেগুলো পানাগড়ে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। বড্ড বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে খামখেয়ালী লেঃ কর্নেল ট্রেডি স্যামসন সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেন বহরমপুরে। তারপর ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত করে ট্রেনের লাগেজ ভ্যানে চাপিয়ে কলকাতা পাঠানো হয়। মৌরী নদীর ব্রিজে দুর্ঘটনা ঘটে। সিন্দুকটা আর পাওয়া যায় নি। পরে স্যামসনকে কোর্ট মার্শাল করা হয়। তদন্তকারী ব্রিটিশ অফিসারের মতে, 'স্যামসন নেটিভদের খুব বিশ্বাস করতেন।'

হাসতে হাসতে বললাম—এ তো দেখছি গুপ্তধনরহস্যে পৌঁছুল! বোগাস!

—হুঁ, বরকধঝ-কচতপট।

—তার মানে?

—পুরনো বাংলা বর্ণপরিচয় দেখে নিও। অক্ষর চেনবার জন্য 'বরকধঝ' লেখা থাকত। আর 'কচতটপ' মাস্টারমশাইরা মুখস্থ করাতেন। ক-বর্গ, চ-বর্গ, ত-বর্ঘ, ট-বর্গ, প-বর্গ। তো তুমি গুপ্তধন রহস্য বললে। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, সব গুপ্তধনের গল্পে হেঁয়ালি বা ধাঁধা থাকা অনিবার্য। ওটা গুপ্তধন আবিষ্কারের সূত্র। কে

বলতে পারে 'বরকধঝ-কচতটপ' সেই সূত্র নয় ?

—আর য়ু সিরিয়াস, কর্নেল ?

—একটা বিষয়ে অন্তত আমি সিরিয়াস। অমরেশ রায় এবং তাঁর সঙ্গীদের সেই সিন্দুক হাতানোই উদ্দেশ্য ছিল। সমস্যা হলো, অমরেশ শুধু 'আমরা' লিখেছেন। সঙ্গীদের নাম লেখেন নি। হারানো পাতা দুটোতে ছিল কিনা জানি না।

—কর্নেল ! কাল রাতে যে পাগলকে দেখেছেন, আমার ধারণা, সে অমরেশবাবুর সঙ্গী ছিল।

কর্নেল একটু পরে আস্তে বললেন—মৌরী নদীর ধারেই কিন্তু কুমারচক উন্মাদ আশ্রম। রেললাইন থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে।

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিলেন। —হ্যাঁ, বলো !···বাহ্। ওয়েল ডান ডার্লিং !···হ্যাঁ। ওঁর নিরাপত্তা দরকার। খুব সাবধান !···ওটা ফরেন্সিক টেস্টের জন্য পাঠিয়ে দাও।

কর্নেল ফোন রেখে বললেন—বরকধঝ-কচতটপ-কে পুলিশ পেয়ে গেছে।

—মিঃ লাহিড়ির ফোন নাকি ?

—হ্যাঁ। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজীর স্ট্যাচুর নীচে দাঁড়িয়ে সেই পদ্যটা আওড়াচ্ছিল। সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করতেই বলে, 'বরকধঝ-কচতটপ।' হাতের ডাণ্ডাটা ফরেন্সিক টেস্ট করতে বললাম। দেখা যাক।

আজকের কাগজে পরিতোষ লাহিড়ির খুনের খবর গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। গতকাল আমার অফ ডে ছিল। দৈনিক সত্যসেবকের আজকের খবরটার ভাষা পড়ে বুঝলাম অন্য কেউ লিখেছে। সম্ভবত সিনিয়র রিপোর্টার কার্তিকদা। পরিতোষবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীও দেওয়া হয়েছে।

কাগজ ভাঁজ করে রেখে বললাম—একটা খটকা লাগছে '

গতকাল ভোরে পরিতোষবাবুর বডি পাওয়া যায়। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর খবর কুমারচকের শচীনবাবু কালই পেয়েছিলেন। হালদারমশাইকে বলেছেন উনি। আশ্চর্য।

কর্নেল বললেন—আশ্চর্য ঠিকই! তবে কুমারচক এখন প্রায় শহর হয়ে উঠেছে। টেলিফোন আছে। ট্রাংককলে খবর পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এটাই প্রশ্ন, কে ট্রাংককল করল? বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—চলো। কাল গড়িয়ায় হরিপদবাবুব বাড়ি যাব ঠিক করেছিলাম। যাওয়া হয়নি। আজ যাওয়া যাক।···

তিন

হরিপদবাবুর দোতলা বাড়িটা ঘিঞ্জি গলির শেষ দিকটায় একটা পুকুরের ধারে একানড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখে বোঝা যায়, টায়ে-টোয়ে খরচা করে কোনক্রমে তৈরি করা হয়েছিল। পুকুরের ওপারে কলোনি এলাকা। ঘন গাছপালার ভেতর ছোট আকারের ঘরবাড়ি।

দোতলার জানালা থেকে আমাদের গাড়ি দাঁড় করানো দেখে থাকবেন হরিপদবাবু। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গে উনিও এসে গেলেন। কর্নেল নমস্কার করলেন। উনিও নমস্কার করে নার্ভাস মুখে বললেন—আপনারা কি সি আই ডি থেকে আসছেন স্যার?

কর্নেল অম্লানবদনে বললেন—হ্যাঁ। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—বেশ তো। আসুন। ওপরে আসুন।

—না, হরিপদবাবু! এখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করে চলে যাব।

—বলুন স্যার!

—আপনি কি 'বাংলায় আগস্টবিপ্লব' নামে কোনও বই পড়েছেন?

হরিপদবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন—না তো। কেন স্যার?

—আপনার ভাড়াটে পরিতোষবাবুর ঘরে বইটা কখনও দেখেছেন ?

পরিতোষদার ঘরে আমি বিশেষ ঢুকিনি। উনি বদরাগী টাইপ লোক ছিলেন। পাড়ায় বাস্তুহারা সমিতি ছিল তখন। সে অনেক বছর আগের কথা স্যার। সমিতির লোকেরা আমাকে এসে ধরলেন। তাঁদের কথায় ভাড়া দিয়েছিলাম।

—আর একটা কথা হরিপদবাবু! আপনার তো টেলিফোন আছে ?

—আছে স্যার।

—টেলিফোনে পরিতোষবাবুকে কেউ ডেকে দিতে বলত ?

হ্যাঁ, স্যার! মাঝে মাঝে টেলিফোন আসত। বাড়িতে যে-যখন থাকত, ওঁকে ডেকে দিত। ওঁর সঙ্গে আমার এবং আমার ফ্যামিলির গুড রিলেশন ছিল।

—গতকাল বা তার আগের দিন কেউ ওকে ফোন করেছিল ?

হরিপদবাবু মাথা নাড়লেন।—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গতকাল সকালেই তো। আমি মিসহ্যাপটার কথা জানিয়ে দিলাম।

—ট্রাংককল কি ?

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ! ট্রাংককল। তাই জিজ্ঞেস করলাম কোথা থেকে বলছেন ? কী একটা জায়গার নাম বলল, বোঝা গেল না। তো স্যার আমি বললাম, পরিতোষবাবুর খবর খারাপ। মার্ডারড্।

—কুমারচক থেকে ট্রাংককল ?

হরিপদবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন—হতেও পারে। বুঝতে পারিনি স্যার। আসলে তখন মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন।

—আর একটা প্রশ্ন। আপনি, যখন পরিতোষবাবুর মার্ডারের খবর পান, তখন ওঁর ঘরের দরজা খোলা ছিল, লক্ষ্য করেছিলেন কি ?

—হ্যাঁ। খোলা ছিল। আসলে আমি অনিদ্রার রুগী স্যার। বেলা অব্দি ঘুমোই। নীচে ডাকাডাকি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আমার ছেলে বাণীব্রত বলল, সাংঘাতিক ব্যাপার। পরিতোষ-জেঠু মার্ডার হয়েছেন। বডি পড়ে আছে রেললাইনের কাছে।

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। রাত তিনটে নাগাদ নীচের ঘরে সাড়াশব্দ পেয়েছি। ভেবেছিলাম, পাগলাকে তাড়া করে পরিতোষদা ফিরে এলেন।

—নীচের ঘরে শব্দ শুনেছিলেন? কী শব্দ?

—দরজা বন্ধ হওয়ার। আরও কী সব শব্দ যেন।

—অথচ পরে দেখলেন দরজা খোলা?

—হ্যাঁ, স্যার!

—পুলিশকে জানিয়েছেন এসব কথা?

পরিতোষবাবু বিব্রতভাবে বললেন—সব কথা গুছিয়ে বলার মতো অবস্থা ছিল না। ওনারাও জিজ্ঞেস করেন নি। ওই দেখুন, ঘরে সিলকরা তালা এঁটে দিয়েছে পুলিশ।

—থ্যাংকস। চলি···

দু-একজন করে কৌতূহলীদের ভিড় জমছিল। কর্নেল গাড়িতে উঠেই বললেন—কুইক জয়ন্ত। বলা যায় না, ভিড় থেকে হয়তো শ্লোগান উঠবে এক্ষুনি 'জবাব চাই জবাব দাও'!

কর্নেল হাসছিলেন। ঘিঞ্জি গলিতে সাইকেল রিকশার ভিড়। বড় রাস্তায় পৌঁছে বললাম—অমরেশবাবুকে খুন করে এসে খুনী হয়তো একইভাবে ওঁর ঘরে ঢুকছিল। নন্দিনী সাড়াশব্দ পায়নি। কারণ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরিতোষবাবুর ঘরে খুনী এসে ঢুকেছিল। ওপরতলা থেকে হরিপদবাবু সেটা টের পান। কিন্তু উনি ভেবেছিলেন, পরিতোষবাবু ফিরে এলেন। ঠিক বলছি বস্?

—হুঁ।

—কী খুঁজতে এসেছিল খুনী? গুপ্তধনের সূত্র?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাবে শুধু হাসলেন। গোলপার্কে পৌঁছনোর পর বললেন—আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে তোমাকে বেরুতে হবে। অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেবে, ক্যাজুয়াল লিভ নিচ্ছ। তিনটে নাগাদ শেয়ালদায় আপ কৃষ্ণনগর লোকাল ধরব। কৃষ্ণনগর থেকে বাসেই যাব। বাসে ঘণ্টাখানেকের জার্নি। আসলে আমরা

ঘুরপথে যেতে চাই। সোজা ট্রেনে গেলে স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্ব। কিন্তু রিস্ক্ না নেওয়াই ভাল।

—কুমারচক যাবেন নাকি?

—আমি যাব অর্কিডের খোঁজে। তুমি যাবে তোমার কাগজের পক্ষ থেকে। উন্মাদ আশ্রম সম্পর্কে রিপোর্টাজ লিখবে। মিনিস্টার যখন পৃষ্ঠপোষক, তখন কাগজের ইন্টারেস্ট থাকতেই পারে। মিনিস্টারেরও পাবলিশিটি হবে। পরবর্তী ভোটে কাজে লাগবে সেটা। পয়েন্টটা বুঝলে তো?

—বুঝলাম। কিন্তু পাগলাগারদ ব্যাপারটা বড্ড অস্বস্তিকর।

—উন্মাদ আশ্রম ডার্লিং!

—একই কথা। বরং হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?

—হালদারমশাই সকালের ট্রেনে আবার গেছেন। তবে এবার গিয়ে সম্ভবত ছদ্মবেশ ধরেছেন।

—কী সর্বনাশ! আবার কী বিভ্রাট বাধাবেন তা হলে।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—তুমি তো জানো, উনি ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ। বলা যায় না, হয়তো পাগল সেজে আশ্রমে ভর্তি হয়েই গেছেন এতক্ষণ···।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে নন্দিনীকে দেখে অবাক হলাম। সে কর্নেলকে বলল—তারাজেঠুদের টেলিফোন হঠাৎ ডেড হয়ে গেছে। তাই চলে এলাম।

কর্নেল বললেন—কতক্ষণ এসেছ?

—মিনিট দশেক আগে। নন্দিনী চাপা স্বরে বলল—মা বলল, কাউকে না জানিয়ে চুপচাপ আসতে। তাই একা এলাম। আমাকে এখনই ফিরতে হবে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন—কিন্তু কি ঘটেছে?

নন্দিনী তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা নীল ইনল্যাণ্ড

লেটার বের করে কর্নেলকে দিল।—আজ বাবার টেবিলের ড্রয়ার গোছাতে গিয়ে এই চিঠিটা পেয়েছি। চিঠিটা দেখুন, মায়ের নামে এসেছিল। বাবা মাকে না দিয়ে কেন লুকিয়ে রেখেছিল বুঝতে পারছি না। মাকে আপনার কথা বলেছিলাম। মা এখন অনেকটা সুস্থ। আপনাকে জানাতে বলল।

কর্নেল চিঠিটা পড়ছিলেন। পড়ার পর আতসকাচে ডাকঘরের ছাপ পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন—গত ২৫ মে লোকাল পোস্ট অফিসে এসে পৌঁছেছিল। তো তোমার মা চিঠিটা পড়ে কী বললেন ?

নন্দিনী বলল—মা বরাবর একটু হিস্টেরিক টাইপ। প্রথমে ভেবেছিলাম চিঠিটা দেখাব না। কিন্তু পরে ভাবলাম দেখানো উচিত। দেখালাম। বলল, কিন্তু বুঝতে পারছি না। তোর তারাজেঠুকে ডাক। তখন আপনার কথা বললাম।

কর্নেল চিঠিটা আমাকে দিলেন। কারণ আমি উসখুস করছিলাম চিঠিটা দেখার জন্য। চিঠিতে শুধু লেখা আছে :

> আপনার স্বামীকে অনেক বলে ব্যর্থ হয়েছি। এবার আপনাকে বলছি। যদি বিধবা না হতে চান, তাকে বলুন অবিলম্বে দেখা করুক। এই শেষ চিঠি।
>
> ইতি—
>
> **বরকধঝ-কচতটপ**

কর্নেলকে ফেরত দিয়ে বললাম—লাহিড়ি সায়েবকে জানিয়ে দিন। থার্ড ডিগ্রিতে চড়ালে পাগলামি ঘুচে যাবে। হাতের লেখা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পাগলের কীর্তি। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং !

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—চিঠিটা বাগবাজার পোস্ট অফিসে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। নকুল মিস্ত্রি লেনের কাছাকাছি।

—তা হলেই বুঝুন !

নন্দিনী ছোট্ট শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল—আমি চলি। পুলিশ এলে কি চিঠির কথা বলব ?

—না চেপে যাও। আমি দেখছি। তবে আজ আড়াইটের পর আমি বাইরে যাব। যদি কিছু জানাবার মতো ঘটে, এই নাম্বারে ফোন করে জানাবে। আমার নাম করবে। তোমার তারাজেঠুর ফোন খারাপ বললে। অন্য কোথাও ফোন পাবে না?

—মোড়ে ওষুধের দোকানে পেয়ে যাব।

কর্নেল একটা চিরকুটে ফোন-নম্বর এবং নাম লিখে দিলেন। বললেন—মিঃ লাহিড়িকে চাই বলবে। আমার নাম করে বলবে, উনি কথা বলতে চান। তা হলে যদি অন্য কেউ ফোন ধরে, সে ওঁকে দেবে। আর উনি নিজেই ফোন ধরলে তো কথা নেই। এটা ওঁর পার্সোনাল ফোন নম্বর। আর তলারটা বাড়ির ফোন নম্বর। রাত আটটা-নটার পর হলে বাড়িতে পাবে ওঁকে।

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল—কে ইনি?

কর্নেল হাসলেন।—আমার এক স্নেহভাজন বন্ধু। তবে তোমার বাবাকে ইনিও বিশেষ চিনতেন।

নন্দিনী চলে যাওয়ার পর কর্নেল টেলিফোন ডায়াল করতে ব্যস্ত হলেন। একটু পরে লাইন পেলেন।—অরিজিৎ? বরকধঝ···হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রকৃত পাগল তো বটেই। তো শোনো! তোমাকে নন্দিনীর কথা বলেছিলাম। আমি নদীয়ার কুমারচক যাচ্ছি। কবে ফিরব ঠিক নেই।··না, না। অর্কিডের খোঁজে। হালদারমশাই আমাকে কুমারচক থেকে একটা অর্কিড এনে দিয়েছেন। যাই হোক, নন্দিনীর মায়ের নামে একটা চিঠি এসেছিল। অমরেশবাবু স্ত্রীকে না দিয়ে সেটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। চিঠিটা ষষ্ঠীর কাছে রেখে যাচ্ছি। তোমাকে দেবে।···হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং চিঠি। বরকধঝ-কে চিঠির কথাগুলো লেখানোর চেষ্টা করবে।···নাহ্। ওকে চিঠি দেখাবে না।···দ্যাটস রাইট। আর নন্দিনীকে তোমার নাম্বার দিয়েছি। পরিচয় দিইনি। কিছু ঘটলে তোমাকে রিং করে জানাবে সে। আর একটা কথা। ওদের বাড়ির কাছে তোমাদের লোক রাখা দরকার মনে হচ্ছে। প্লিজ অরিজিৎ! দিস ইস ইমপর্ট্যান্ট।···ও কে! ছাড়ছি।···

ফোন ছেড়ে কর্নেল হাঁকলেন—ষষ্ঠী।

ষষ্ঠীচরণ পর্দার ফাঁকে মুখ বের করে বলল—লাঞ্চো রেডি বাবামশাই।

—লাঞ্চো পরে খাচ্ছি। তুই কাগজের দাদাবাবুকে নিয়ে যা। নীচে গিয়ে গোমস্‌কে বল্‌, বেসমেণ্টের গ্যারাজে জয়ন্তের গাড়ি থাকবে। আমার গাড়ির পাশে জায়গা পেয়ে যাবে, জয়ন্ত! যাও। ভয় নেই। গাড়ি চুরি যাবে না। গোমস্‌ খুব কড়া লোক।··

কৃষ্ণনগর থেকে ভিড়ে বোঝাই বাসটা যখন আমাদের কুমারচক পৌঁছে দিল, তখন চারদিকে সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। কিন্তু এ কোথায় এলাম? পিচরাস্তার ধারে কয়েকটা ঘুপচি দোকানপাট। কাছাকাছি আর কোনও ঘরবাড়ি নেই। উঁচু-নিচু গাছপালা আর আবাদী-অনাবাদী মাঠ। বললাম—কোথায় কুমারচক?

কর্নেল বললেন—আছে। গাছপালার আড়ালে ওই দেখ আলো ঝিকমিক করছে। মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্ব।

—তা হলে এখানে নামলাম কেন?

—এটাই বাসস্টপ। কুমারচক ডাকবাংলোর স্টপ বলে লোকে। দাঁড়াও। একটা সাইকেল-রিকশা ডাকি।

বাস থেকে জনাকতক যাত্রী নেমেছিল। তারা কেউ সাইকেল রিকশায়, কেউ পায়ে হেঁটে চলে গেল। আমাদের দেখে একজন রিকশাওলা এগিয়ে এসেছিল। কর্নেলের চেহারা দেখেই তার শ্রদ্ধাভাব কিংবা বড় দাঁও মারার মতলব যেন।—আসুন স্যার! লিয়ে যাই। ডাকবাংলায় যাবেন তো স্যার? দশ টাকা রেট। ফরেস্টবাংলা কুড়ি টাকা। ট্যুরিস্ট লজ হলে পঁচিশ লাগবে স্যার! রাস্তা খারাপ।

কর্নেল রিকশায় উঠে বললেন—ফরেস্ট বাংলো।

বাসরাস্তাটা ধরে এগিয়ে রিকশাওলা বলল—আমি বলেই যাচ্ছি স্যার! অন্য কেউ আসত না। সন্ধ্যেবেলা আজকাল বড্ড ছিনতাইয়ের ভয়।

—পাগলেরও ভয়।

রিকশাওলা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।—আজ্ঞে?

—বলছি পাগলের পাল্লায় পড়ার ভয়ও আছে। কারণ কুমারচকে নাকি পাগলাগারদ আছে শুনেছি।

রিকশাওলা আমোদে খিকখিক করে হাসতে লাগল। পিচরাস্তা থেকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া খোয়াঢাকা সংকীর্ণ রাস্তায় রিকশা জোরে গড়াচ্ছিল এবার। সমতলে পৌঁছে সে বলল—কথাটা স্যার মিথ্যে বলেন নি। শুনলাম, গারদ ভেঙে দেবুবাবু পালিয়ে গেছে। আগের দিন কাকে কামড়ে দিয়েছিল। পাগলাদের দাঁতে বিষ আছে স্যার। তার নাকি মরো-মরো অবস্থা।

—পাগলের নাম দেবুবাবু?

—আজ্ঞে। অনেক বছর ধরে পাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওনার এক ভাই চণ্ডীবাবু সবরেজেটিরি আপিসের মুহুরি। গত মাসে দাদাকে কোথেকে ধরে এনে শচীনবাবুদের পাগলাগারদে ভর্তি করেছিল। কিন্তু দেবুবাবুকে ধরে রাখতে পারে? শুনেছি, গরমেণ্টের জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছিল। গরমেণ্টই ধরতে পারে নি।

সে রিকশা থামিয়ে নামল। রিকশার মাথার ল্যাম্পটা জেলে নিল। দুধারে উঁচু গাছ। অন্ধকার এখন গাঢ় হয়েছে। কর্নেল টর্চের আলো জেলে সামনে ও পাশটা দেখছিলেন। রিকশাওলা তার রিকশায় উঠে প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল—টর্চ জ্বালবেন না স্যার। তাহলে আর দেখতেই পাব না কিছু।

—তুমি ঠিক বলেছ। তোমার নাম কী হে?

—আজ্ঞে স্যার, নেয়ামত আলি।

—কুমারচকেই বাড়ি?

—আজ্ঞে, ছিল। এখন ডাকবাংলার বাসটপে থাকি।

—কুমারচক ছেড়ে চলে এলে কেন?

—ভাইদের সঙ্গে বনিবনা হলো না। জমিজিরেত তো নেই। তাই চলে এলাম। বাসটপ থেকে প্যাসেঞ্জার পাই। দুটো পয়সা বেশি রোজগার হয়।

রিকশাওলাটি খুব কথা-বলিয়ে লোক। দেশের হালচাল, রাজনীতি, পার্টিবাজি, ভোট-এ সবই তার নখদর্পণে এবং তার এসব বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও আছে। কর্নেল দিব্যি ওই বিরক্তিকর প্রসঙ্গ নিয়ে কথার যোগান দিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাঁদিকে রিকশা মোড় নিল। এতক্ষণে সামনে দূরে গাছপালার ভেতর বিদ্যুতের আলোর ছটা চোখে পড়ল। এবার সামান্য চড়াই। রিকশাওলা সিট থেকে নামলে কর্নেল বললেন—ঠিক আছে নেয়ামত। আমরা এটুকু হেঁটে চলে যাব। এই নাও তোমার ভাড়া।

রিকশাওলা খুশি হয়ে চলে গেল। কর্নেল হাঁটতে হাঁটতে বললেন—তুমি একবার বলেছিলে রিকশায় চাপা অন্যায় এবং আমি কেন রিকশায় চাপি? জয়ন্ত, আমি শ্রমের বিনিময়ে মজুরি দিচ্ছি বলে তৃপ্তি পাই, এমন কিন্তু নয়। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, বিশেষ-বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আমি রিকশায় চাপি। এটুকু রাস্তা অনায়াসে হেঁটে আসতে পারতাম। কিন্তু বরকধঝ-কচতটপ-র নাম যে দেবীবাবু এবং সাবরেজেস্ট্রি অফিসের মুহুরি চণ্ডীবাবু যে তাঁর ভাই, এই তথ্যটা এত শীগগির কি জানতে পারতাম? আমি দেখেছি, মফস্বলের রিকশাওলারা অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখে। এরা একেকজন একেকটি তথ্যকেন্দ্র।

ফরেস্টবাংলোটা একটা উঁচু জায়গায়। গেটের সামনে যেতেই এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত এগিয়ে এসে স্যালুট ঠুকলেন।—আসুন কর্নেলসায়েব! ডি এফ ও সায়েবের লোক বিকেলে আমার কোয়ার্টারে মেসেজ দিয়ে গেল। তখনই চলে এলাম বাংলোয়। কিন্তু ট্রেন চলে গেল। আপনার দেখা নেই। তাই ভাবলাম আজ আর আসছেন না।

কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম অনন্ত বিশ্বাস। একসময় ডিফেন্সে ছিলেন। পরে ওড়িশার একটা জঙ্গলে রেঞ্জার ছিলেন। চোরাশিকারিদের সঙ্গে ঝামেলায় চাকরি ছেড়ে দেন। তারপর আবার সেই জঙ্গলের চাকরি জুটিয়েছেন। তবে এ জঙ্গল

ওঁর ভাষায় 'নিরিমিষ জঙ্গল'। মৌরী নদীর দুধারে একসময় বাঘ-ভালুকের জঙ্গল ছিল। পরে জঙ্গল প্রায় উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। পরিবেশ রক্ষার কারণে সরকার গত তিরিশ বছর ধরে গাছ লাগিয়ে জঙ্গলটার ভোল ফিরিয়েছেন। তবে বাঘ-ভালুক নেই। বছর তিনেক আগে একটা ডিয়ার পার্ক হয়েছে। এই পর্যন্ত।

বাংলোয় কেয়ারটেকার-কাম-চৌকিদার ভোলা কর্নেলকে চেনে। মালী নবও চেনে। কুমারচকে কর্নেল দু'বছর আগে এসেছিলেন। অথচ আমাকে বলেন নি।

অনন্তবাবু সাইকেলে চেপে চলে গেলেন। আমরা বাংলোর উত্তরের বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছিলাম। আলোর শেষ প্রান্তে ছোট্ট গেট। গেট থেকে পায়েচলা পথ জঙ্গলের ভেতর নেমে গেছে। কর্নেল বললেন—শ'দুই মিটার হেঁটে গেলে মৌরী নদী। এদিকটায় দিনে একটা পুকুর দেখতে পাবে। তারই মাটি টিলার মতো উঁচু করে এই বাংলো তৈরি হয়েছিল। নদীতে যত বন্যাই হোক, বাংলো ডোবে না। পুকুরটা নদীর জল পাম্প করে এনে গ্রীষ্মে ভর্তি রাখা হয়। পুকুরে প্রচুর মাছ আছে।

নব মালী বারান্দার শেষ দিকটায় বসেছিল। বলল—আর তত মাছ নেই স্যার! চোরের খুব উপদ্রব বাড়ছে। এই তো সেদিন রাতে জাল ফেলে ধরে নিয়ে গেল। আমরা ভয়ে বেরুতে পারিনি।

—ফরেস্টগার্ড ছিল দেখেছিলাম। তারা কী করে?

নব হাসল।—গার্ড স্যার নামেই। নাইট ডিউটির সময় বাড়ি গিয়ে ঘুমোয়। সবই খাতা-কলমে। যত ঝামেলা আমার আর ভোলাদার। আজ রাতে রঘু আর কাশেমের ডিউটি নদীর ওপারে। এপারে ডিউটি শ্যামা আর লালুর। খাতায় সই করে বেরিয়ে গেছে। মাঝরাতে কান করলে শুনবেন গাছ কাটার শব্দ। ট্রাক কি নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে যায়। ধরবে কে? তবে হ্যাঁ, বন্দুকের ফটাস্ ফট্ শুনতে পাবেন। কৈফৎ দিতে হবে তো?

ভোলা কিচেন থেকে বলল—কী ফালতু বকবক করিস নব?

সায়েবদের ডিসটাব হচ্ছে না?

কর্নেল বললেন—না, না! নবর গল্প শুনতে ভালই লাগছে। আচ্ছা নব, আসার পথে শুনলাম, কুমারচকের পাগলাগারদ থেকে এক খুনে পাগল পালিয়ে গেছে।

—ও। হ্যাঁ। আমিও শুনেছি স্যার! বলে সে ডাকল—ভোলাদা!

কিচেন থেকে ভোলা সাড়া দিল শুধু।

—ভোলাদা তার পাল্লায় পড়েছিল স্যার। নব বলল। সে হেসে অস্থির হচ্ছিল।—সেদিন কলকাতা থেকে এক অফিসার এসেছিলেন। সঙ্গে ফেমিলি ছিল। ভোলাদা সাইকেলে বাজার করে ফিরছে। ফরেস্টের এরিয়ায় স্যার, পড়বি তো পড় একেবারে তার মুখে। তারপর কী হলো সায়েবদের বলো ভোলাদা।

কর্নেল ডাকলেন—ভোলা। রান্না পরে হবে। এসো, গল্প করা যাক।

ভোলা বেরিয়ে এল একটু পরে। গামছায় হাত মুছে হাসতে হাসতে বলল—আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। সাইকেলে জঙ্গল ভেঙে সোজা আসছি। তখন বেলা প্রায় দশটা-এগারোটা হবে স্যার! ভাবলাম লুকিয়ে কেউ ডাল কাটতে এসেছে। হাতে কী একটা আছেও বটে। যেই বলেছি, কে রে? অমনি কী যেন বলে তেড়ে এল।

—বরকধঝ-কচতটপ?

—তা-ই হবে। তবে স্যার, হাতে একটা শাবল ছিল। আমি পালিয়ে এলাম। কুমারচকে এক চণ্ডীবাবু আছে। তারই দাদা। কিন্তু তখনও জানি না, সে পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। শাবল ছুঁড়েছিল স্যার! জোর বেঁচে গেছি।

কর্নেল আস্তে বললেন—শাবল?

ভোলা হাসতে লাগল।—লালুকে বলেছিলাম। আমাদের গার্ড স্যার। লালু শাবলখানা কুড়িয়ে এনেছিল। পাগলাবাবুকে দেখতে পায়নি।…

চার

নতুন জায়গায় গেলে আমার যা হয়। ঘুম আসতে চায় না। মশার উপদ্রব নেই। গরমও নেই। কারণ ঘরটা এয়ারকণ্ডিশনড। রহস্যভেদী টেবিলবাতির আলোয় কী সব লেখালেখি করছিলেন, বোঝা গেল না। একবার দেখলাম, আস্তেসুস্থে উঠে বাথরুমে ঢুকলেন। সেই সময় বাইরে খুব চাপা যান্ত্রিক গরগর শব্দ শুনতে পেলাম। বাথরুমের দরজা বন্ধ হলে শব্দটা আর শোনা গেল না। পাশ ফিরে ঘুমুনোর চেষ্টা করলাম। বাথরুম খুলে উনি যখন বেরুচ্ছেন তখন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আবার সেই শব্দ। ঘুরে বললাম—বাইরে যেন গাড়ির শব্দ শুনলাম ?

কর্নেল শুধু বললেন—হুঁ।

—কোনও অফিসার এলেন নাকি ?

—আসতেই পারেন। কর্নেল টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন। ফের বললেন—তেমন হোমরা-চোমরা কেউ এলেও এ ঘর ছাড়তে হবে না আমাদের। কারণ বাকি ঘরটাও এয়ারকণ্ডিশনড।

—এই বাংলোর এয়ারকণ্ডিশনার যন্ত্র নতুন মনে হচ্ছে।

—কেন ?

—তেমন শব্দ করছে না। আপনার মনে পড়ছে ? দরিয়াগঞ্জ বাংলোয় সারারাত কী শব্দ ! শেষে বন্ধ করে জানালা খুলে দিতে হলো। চিন্তা করুন, তখন অক্টোবর মাস। কী মশা ! কী মশা !

—কথা বললে আর ঘুমই আসবে না ডার্লিং !

—এমনিতেই ঘুম আসছে না।

—বাইরে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে এসো। বাঘ-ভালুক নেই। কৃষ্ণপক্ষ হলেও এতক্ষণে চাঁদ ওঠার কথা। বরং নদীর ধারে চলে যাও। মুগ্ধ হবে।

—আপনিও চলুন না!

—আমার হাতে জরুরি একটা কাজ। ছেড়ে গেলে খেই হারিয়ে যাবে।

একটু ইতস্তত করে উঠে পড়লাম। বেরুতে যাচ্ছি, কর্নেল বললেন—সঙ্গে টর্চ নিয়ে যাও। আর—তোমার ফায়ারআর্মসটা কি এনেছ?

—হ্যাঁ। ফায়ারআর্মস কী হবে?

—পাগলের পাল্লায় পড়লে তাকে ভয় দেখাবে। বলা যায় না, আবার কোনও পাগল পালিয়ে আসতে পারে। সাবধান! কর্নেল হাসছিলেন।—কিংবা ধরো, বিষাক্ত সাপের পাল্লায় পড়লে অস্ত্রটা কাজ দেবে। গ্রীষ্মে সাপ বেরুনো স্বাভাবিক।

সাপের কথা ভেবেই রিভলভার আর টর্চ নিলাম। দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি, ভোলা পাশের ঘরের দরজা থেকে সবে বেরুচ্ছে। আমাকে দেখে সে সেলাম দিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবেন স্যার?

—ঘুম আসছে না। নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে আসি।

—এত রাতে নদীর ধারে যাবেন?

—কেন? বাঘ-ভালুক তো নেই।

ভোলা কাঁচুমাচু মুখে হাসল।—সাড়ে এগারোটা বাজে স্যার! জঙ্গল জায়গা। ওদিকটায় একসময় শ্মশান ছিল শুনেছি। রাত-বিরেতে একা বেরুবেন? সঙ্গে যেতাম বরং। কিন্তু কলকাতা থেকে এক সায়েব-মেমসায়েব এলেন এখুনি। ওই দেখুন ওনাদের জিপগাড়ি। চা-কফি খাবেন-টাবেন। আমার স্যার এই এক জ্বালা!

বারান্দা ঘুরে উত্তরে যাচ্ছি, ভোলা ফের বলল—গেটে তালা আছে স্যার! খুলে দিচ্ছি চলুন।

ছোট্ট গেটের তালা খুলে দিল ভোলা। দুধারে ঝোপঝাড়। ঢালু হয়ে একফালি পায়ে-চলা পথ নেমে গেছে। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেলাম। সামনে ফাঁকা ঘাসে-ঢাকা জমি।

তারপর নদী। নদীটা ছোট। বালির চড়া পড়েছে। কিন্তু জল আছে। খুব ধীরে স্রোত বইছে। টর্চ নিভিয়ে আধখানা চাঁদের আলোয় আদিম প্রকৃতির রূপ দেখছিলাম।

সাপের ভয়ে অবশ্য মাঝে মাঝে পায়ের চারদিকে টর্চের আলো ফেলছিলাম। একটু পরে ঘাসজমি থেকে নদীর শুকনো ঢালু খাড়ি দিয়ে নেমে বালির চড়ায় চলে গেলাম। হালকা এলোমেলো বাতাস বইছিল। বালিও শুকনো। বসে পড়লাম। ভোলা শ্মশানের কথা বলায় একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ভূতে না বিশ্বাস করলেও ভূতের ভয় আছে। তা ছাড়া এই আদিম প্রকৃতিতে নিশুতি রাতে আবছা জ্যোৎস্নায় সবকিছুই কেমন রহস্যময় মনে হয়। কোথাও রাতপাখি ডেকে উঠল। একটু পরে মাথার ওপর দিয়ে ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে উড়ে গেল প্যাঁচা। সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, নদীর ওপারে গাছ-পালার ভেতর লালচে আলোর বিন্দু জুগজুগ করছে।

কেউ সিগারেট টানছে। কিন্তু এত রাতে জঙ্গলে এসে কেউ সিগারেট টানছে, এটা অস্বাভাবিক মনে হলো। ওপারে তো কোনও বসতি নেই। কোনও বাংলোও নেই যে আমার মতো কোনও বাইরের লোক অনিদ্রার কারণে বেড়াতে বেরুবে। চোরাই কাঠচালানকারী নয় তো?

একবার ভাবলাম, গিয়ে সোজা চার্জ করব। কিন্তু বালির চড়ার নীচে আন্দাজ পনের-কুড়ি মিটার চওড়া জল। জলটা কত গভীর জানি না। এখান থেকে টর্চের আলোও অতদূর পৌঁছুবে না। খামোকা লোকটা সতর্ক হবে এবং পালিয়ে যাবে।

গুঁড়ি মেরে এপারে চলে এলাম। পাড়ে উঠে ঘাসজমি পেরিয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখলাম। একটা ছায়ামূর্তি সিগারেট টানতে টানতে জলের ধারে এল। সিগারেটটা জলে ছুঁড়ে ফেলল। জলের গভীরতা নিশ্চয় কম। কারণ সে জল পেরিয়ে বালির চড়ায় উঠল।

জ্যোৎস্নায় তাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। কোনও গ্রাম্য

লোক নয়। পরনে প্যান্ট-শার্ট এবং হাতে লাঠির মতো কী একটা আছে। নদীর ঢালে এগিয়ে এসে সে ওটা কাঁধে তুললে বুঝতে পারলাম, ওটা বন্দুক।

পা টিপে টিপে বাংলোয় ওঠার রাস্তায় একটা ঝোপের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম। বন্দুকধারী লোকটার গতিবিধি সন্দেহজনক। সে এসে আমার নাকের ডগা দিয়ে বাংলোর গেটে চলে গেল। একটু থমকে দাঁড়াল গেটের কাছে। তারপর টর্চ জ্বালল এতক্ষণে। সম্ভবত গেট খোলা দেখে সে অবাক হয়েছে।

তারপর সে গেট খুলে ঢুকে গেল এবং এবার আমাকে অবাক করে চেঁচিয়ে ডাকল—ভোলা! অ্যাই ভোলা!

ভোলার সাড়া পাওয়া গেল—কে? কাশেমবাবু নাকি?

কাশেমবাবু! তার মানে ফরেস্টগার্ড কাশেম, যার কথা ভোলা বলছিল। এ-ও বলছিল, কাশেমের ডিউটি আছে নদীর ওপারে। সব রহস্য মাঠে মারা গেল। এগিয়ে গেলাম গেটের দিকে।

ভোলা বলছে—নদীর ধারে কলকাতার এক সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়নি? উনি তো কিছুক্ষণ আগে বেড়াতে বেরুলেন।

বনরক্ষী বলছে—কাকেও তো দেখলাম না।

—সে কী! সর্বনাশ! উনি গেলেন কোথায়? কর্নেল সায়েবকে খবর দিই।

—সেই কর্নেলসায়েব এসেছেন নাকি?

—হ্যাঁ। ওনার সঙ্গেই এসেছেন আরেক সায়েব।

বনরক্ষী চাপা গলায় বলে উঠল—টিকটিকি পাঠিয়েছে নাকি ওপর থেকে? সর্বনাশ হয়েছে। ভোলা। সেনসায়েবের আসার কথা! আসেন নি?

—এসেছেন। এবার সঙ্গে মেমসায়েবও এসেছেন।

ওরা কথা বলতে বলতে ফুলবাগান পেরিয়ে বাংলোর বারান্দার দিকে যাচ্ছিল। বনরক্ষীর মুখে 'টিকটিকি' এবং 'সর্বনাশ হয়েছে' এই কথা দুটো শুনেই আমি সাড়া দিতে গিয়ে চুপ করেছিলাম।

প্রথমে রহস্য নেই ভেবেছিলাম। কিন্তু রহস্য একটা আছে দেখা যাচ্ছে।

বারান্দা ঘুরে গিয়ে আমাদের রুমের দরজায় আস্তে নক করলাম। ভেতর থেকে কর্নেল বললেন—খোলা আছে।

ভেতরে ঢুকে চাপা গলায় বললাম—একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

—পাগল, নাকি ভূত ?

—নাহ্। বলে কর্নেলকে সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিলাম।

শোনার পর কর্নেল হাসলেন।—কাঠপাচার হবে ডার্লিং। কোনও এক সেনসায়েব সম্ভবত কাঠপাচার চক্রের চাঁই। বনরক্ষী কাশেমের সঙ্গে তার যোগসাজস আছে বোঝা যাচ্ছে। সেনসায়েব চতুর লোক বলেই সঙ্গে মেমসায়েবকে এনেছে। সেই মেমসায়েব যে তার বউ, এ কথা হলফ করে বলা কঠিন।

—ভোলাও এর সঙ্গে যুক্ত।

—জয়ন্ত, প্রাণের দায়ে বা চাকরির দায়ে আজকাল অনেক মানুষকে সব জেনেও মুখ বুজে থাকতে হয়।

—পুলিশে এখনই গিয়ে খবর দিয়ে আসা উচিত। হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে ওরা।

কর্নেল টেবিলের কাগজগুলো গুছিয়ে বললেন—কাঠপাচারের চেয়ে আমি এখন একটা মন্দিরের রহস্য দামী মনে করছি।

—মন্দির! মন্দির কোথা থেকে এল ?

—বরকধঝ-কচতটপ থেকে!

—অ্যাঁ ?

—হ্যাঁঃ।

দরজায় নক করল কেউ। কর্নেল বললেন—খোলা আছে।

ভোলা ঢুকেই আমাকে দেখে হাসল।—এসে গেছেন! ওঃ! খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম স্যার! গার্ড কাশেম এইমাত্র নদীর ওপার থেকে এল। জিজ্ঞেস করলে বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

কর্নেল বললেন—গার্ডরা রাতবিরেতে তোমাকে জ্বালাতে আসে দেখছি!

ভোলা বিব্রতমুখে বলল—হ্যাঁ, স্যার! ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে, চা খাব।

—কাশেম চা খেতে এসেছে?

—আজ্ঞে! বলে ভোলা বেরুনোর জন্য ঘুরল।

—পাশের ঘরে কে এসেছেন ভোলা?

—সেনসায়েব স্যার! মিনিস্টারের সঙ্গে ওনার খাতির আছে। মিনিস্টার আমাদের কুমারচকের রাজবাড়ির লোক স্যার। তা তো জানেন! মাঝে মাঝে আসেন সেনসায়েব। এবার সঙ্গে মেমসায়েবও এসেছেন।

—ঠিক আছে! তুমি এসো। এবার আমরা শুয়ে পড়ব।

দরজা লক করে কর্নেল শুয়ে পড়লেন। তারপরই ওঁর নাক ডাকা শুরু হলো! বরকদ্বঝ-কচতটপের সঙ্গে একটা মন্দিরের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছিলাম না। একসময় হাল ছেড়ে দিলাম।...

ঘুম ভাঙতে বেলা হয়েছিল। কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ভোলাকে বলে চা-বিস্কুট খাওয়া গেল। তারপর উত্তরের বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে কর্নেলের প্রতীক্ষা করছিলাম। নব ফুলবাগানে খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। কাজ শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখে সেলাম দিয়ে বলল—কর্নেল-সায়েব নদীর ওপারের জঙ্গলে পাখি দেখতে গেছেন। দেখুন, কখন ফেরেন। সেবার এসে সারাটা দিন জঙ্গলে ঘুরেই কাটালেন। এদিকে আমরা ভেবে সারা।

কথা বলতে বলতে সে সিঁড়িতে এসে বসল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে চাপা স্বরে বলল—কাল অনেক রাতে কলকাতা থেকে সেনসায়েব নামে এক সায়েব এসেছেন। মাঝে মাঝে আসেন বেড়াতে। এবার সঙ্গে ওনার মেমসায়েবও এসেছেন। ভোরবেলা দেখলাম, সেনসায়েব জিপগাড়ি নিয়ে একা বেরিয়ে গেলেন। আবার একটু আগে দেখলাম, কুমারচকের ঝন্টুবাবুর ছেলে এসে মেমসায়েবকে নিয়ে নদীর ধারে গেল। কী যে চলছে সব, বুঝি না!

নব সকৌতুকে নিঃশব্দে হাসছিল। লোকটি আমুদে প্রকৃতির। বললাম—কী চলছে বলে মনে হচ্ছে তোমার?

—ঝন্টুবাবু সেবার সেনসায়েবকে ফাঁসিয়েছিল। নব ফিসফিস করে বলল—জঙ্গল থেকে গাছ কেটে সাবাড় করে দিচ্ছে। শুনেছি, সেনসায়েব নানা জায়গার কাঠগোলার মালিকদের কাছে টাকা খায়। মিনিস্টারের পেয়ারের লোক স্যার! যতবার আসে, কয়েক ট্রাক করে কাঠ চালান যায়। থানা-পুলিশ চুপ করে থাকে। সেবার ডি এফ ও ছিলেন কড়া লোক। ঝন্টুবাবুদের গিয়ে ধরলেন। ওনারা মিটিং করলেন। তারপর বংশীতলার মোড়ে ঝন্টুবাবুরা লোক জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাক ধরলেন। পুলিশ গেল। সেনসায়েব গতিক বুঝে সটকানোর তালে ছিলেন। পুলিশ এসে ধরল। পরে অবশ্যি ছেড়ে দিয়েছিল। সায়েবসুবো লোক স্যার! তাতে মিনি-স্টারের চেনাজানা। কিন্তু পরে বোধকরি ঝন্টুবাবুর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছে। তা না হলে সেনসায়েব যখন তখন আর আসছেন কী করে? এদিকে দেখুন ঝন্টুবাবুর ছেলের সঙ্গে মেমসায়েবের চেনা-জানা।

—ঝন্টুবাবু কে?

—ওই যে পাগলাগারদ করেছেন। কী যেন নামটা······

—শচীন মজুমদার?

নব হাসল—হ্যাঁ, স্যার! চেনেন নাকি?

—নাম শুনেছি। ওর ছেলের নাম কী?

—বিলুবাবু। এ তল্লাটের ডাকসাইটে গুণ্ডা স্যার! বি এ পাশ। মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যত খুনে মস্তান, সব ওর চেলা। মোটর সাইকেলে চেপে এল। সেনসায়েবের রুমে ঢুকল। একটু পরে মেমসায়েবকে নিয়ে এই গেট দিয়ে বেরুল। আপনি তখন বোধকরি ঘুমিয়ে ছিলেন।

নব হঠাৎ উঠে গেল। বাংলোর পশ্চিমে গাছপালার আড়ালে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছিল। সে সেই দিকে চলে গেল।

একটু ইতস্তত করে উঠে পড়লাম। এই কৌতূহল অশালীন স্বীকার করছি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা বোঝার নেশা পেয়ে বসেছিল। একটা রোমান্টিক ঘটনার আড়ালে কিছু নেই তো?

ঘরে গিয়ে ফায়ারআর্মসটা নিয়ে এলাম। উত্তরে নদীর দিকের গেটে যাচ্ছি, ভোলা দৌড়ে এল।—ব্রেকফাস্ট রেডি স্যার! কর্নেলসায়েব কখন ফিরবেন ঠিক নেই। আমি বাজার করতে যাব।

বললাম—এখনই আসছি। তুমি বাজারে গেলে নবকে বলে যেও। বেড়ালের হাত থেকে ব্রেকফাস্ট পাহারা দেবে।

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, ভোলা আমাকে এখন ওদিকে যেতে দিতে চাইছে না। একবার ঘুরে দেখলাম, ভোলা কেমন চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নদীর ধারে কেউ কোথাও নেই। বালির চড়া পেরিয়ে গেলাম। কাল রাতে টের পেয়েছিলাম, নদীর জলের গভীরতা কম। দিনের আলোয় দেখলাম, কালো স্বচ্ছ জল কোনওক্রমে বালি ছুঁয়ে ছটফট করে বয়ে যাচ্ছে। পায়ে স্লিপার ছিল। খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট একটু গুটিয়ে ওপারে গেলাম। এ পাড় খুবই ঢালু। ঝোপঝাড় চিরে একফালি পায়ে-চলা পথ এগিয়ে গেছে ঘন এবং উঁচু জঙ্গলের ভেতরে।

সতর্ক দৃষ্টি ফেলে হাঁটছিলাম। কিছুটা চলার পর আবছা কথাবার্তা কানে এল ডানদিক থেকে। বিশাল একটা বটগাছ অজস্র ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় প্রকাণ্ড সব ইট-কংক্রিটের চাঙড়। কোনও আমলে বাড়ি বা মন্দির ছিল নিশ্চয়। কয়েক পা এগোতেই চোখে পড়ল, একটা প্রকাণ্ড চাঙড়ের ওপর বসে কথা বলছে, নিশ্চয় সেই মেমসায়েব এবং একজন শক্তসমর্থ গড়নের যুবক। মেমসায়েবের পরনে জংলি ছাপের শাড়ি, হাতকাটা ব্লাউস। যুবকটির পরনে জিনসের প্যান্ট, লাল গেঞ্জি। বটের ঝুরির আড়ালে গুঁড়ি মেরে সাবধানে তাদের প্রায় কাছাকাছি চলে গেলাম। একটা ঝোপের আড়ালে বসলাম। মিটার দশেক দূরত্বে ওরা বসে আছে।

ওদের পিঠ দেখতে পাচ্ছি। সামনের ঝুরিটা একটা বাধা সৃষ্টি করছে। কিছু আর তেমন লুকোবার জায়গা নেই।

দৃশ্যটা সিনেমায় দেখেছি। বাস্তব জীবনেও এমন ঘটতে পারে ভাবিনি। তবে নাহ, ওরা গান গাইছে না। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

ঠিক এই সময় আমার ডানদিকে কোথাও চাপা শব্দ হলো। শুকনো পাতায় হাঁটাচলার মতো। হঠাৎ দেখি, লতাপাতা ঢাকা স্তূপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছে কেউ। যুবক-যুবতী এমনই প্রেমোন্মত্ত যে কিছু টের পাচ্ছে না। লতাপাতার ভেতর থেকে এবার একটা মাথা দেখা গেল। সে খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল। তারপর সাংঘাতিক চমকে উঠলাম। লোকটার হাতে একটা ভোজালি।

সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বের করে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম—এক পা নড়লে গুলি করব।

খুনে লোকটা এক লাফে স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে গেল। ঝোঁকের মাথায় একটা গুলি ছুড়লাম। দু-তিন সেকেণ্ডের ঘটনা। যুবক-যুবতী ছিটকে সরে গিয়েছিল। এখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সামনে গেলাম বীরের ভঙ্গিতে।

যুবকটি ভুরু কুঁচকে বলল—থ্যাংকস।

—আপনি কি বিলুবাবু?

হ্যাঁ। আপনি কে?

—আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি। একজন সাংবাদিক। এখানে বেড়াতে এসেছি।

—আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি। আমি বোকার মতো একটা ফাঁদে ধরা দিতে এসেছিলাম। বলে সে 'মেমসায়েবের' দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল।

'মেমসায়েব' কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে উঠল—বিশ্বাস করো বিলু। আমি জানতাম না—

—শাট আপ! আর একটা কথা বললে শেষ করে দেব। আমার

নাম বিলু। বলে সে জিনসের পেছন পকেট থেকে একটা খুদে রিভলবার বের করল। আমার দিকে ঘুরে বলল—আমারও 'মেশিন' আছে দাদা! কিন্তু আমি ভাবিনি, গোপন কথা আছে বলে এখানে ডেকে এনে—ওঃ। দাঁড়াও। দেখছি তোমার হাজব্যাণ্ড শালাকে। শুওরের বাচ্চার বডি যদি আজই না ফেলে দিই তো ঝন্টু মজুমদারের ঔরসে আমার জন্ম হয়নি।

সে প্রায় দৌড়ে চলে গেল হিংস্র প্রাণীর মতো। 'মেমসায়েব' দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। বললাম—কে আপনি?

কান্না থামছে না দেখে খাপ্পা হয়ে বললাম—ন্যাকামি ছাড়ুন। কে আপনি? ঠিক ঠিক জবাব না পেলে আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। শুনলেন তো আমি সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকে এই জঙ্গলে চোরা কাঠপাচারের তদন্তে এসেছি। আপনিও দেখছি এর সঙ্গে জড়িত। আপনি সত্যি কথা না বললে আপনার ছবিও ছেপে দেব কাগজে। বুঝতে পারছেন কী বলছি?

'মেমসায়েব' এবার রুমালে চোখ মুছে মাথা নাড়লেন। করুণ মুখে বললেন—বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।

—আপনার নাম কী?

—নীতা সেন। আমি কুমারচকেরই মেয়ে।

—আপনার স্বামীর নাম?

সুকমল সেন। আপনি আমার সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, সত্যি আমি কিছু জানি না। বিলু আমাকে অকারণ ভুল বুঝে গেল। আমার ভয় করছে। আপনি আমাকে বাংলোয় পৌঁছে দিন প্লিজ!

চারদিক দেখে নিয়ে বললাম—চলুন।

বটগাছটা পেরিয়ে গিয়ে নীতা কান্নাজড়ানো গলায় বলল—আমি জানি, আমার স্বামী লোক ভাল নয়। আমার জীবনটাকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু আমার যাবার কোনও জায়গা নেই। মরতে ভয় করে। নৈলে কবে মরে যেতাম।

—আপনি বললেন কুমারচকের মেয়ে। ওখানে কেউ নেই আপনার ?

—দূর সম্পর্কের এক কাকা আছেন। কিন্তু তিনি গরিব মানুষ। আমার দায়দায়িত্ব নেন নি। কলকাতায় আমার মামা ছিলেন। সেখানে পাঠিয়ে দেন। মামা মরার আগে আমার এই সর্বনাশ করে গেছেন।

—কুমারচকে আপনার সেই কাকার নাম কী ?

—চণ্ডিপ্রসাদ দাশগুপ্ত।

একটু অবাক হয়ে বললাম—চণ্ডীবাবু ? মানে যিনি সাবরেজেস্ট্রি অফিসে কাজ করেন ?

—হ্যাঁ। আপনি চেনেন ?

—সাংবাদিকদের অনেক খোঁজ রাখতে হয়। তো আপনার বাবার নাম ?

—বাবা···নীতা ঢোক গিলে কান্না সামলে বলল—বাবা বেঁচে থেকেও ভেডম্যান। মা তো আমার ছেলেবেলায় মারা যান। আমার বাবা ফ্রিডম-ফ্রাইটার ছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে মাকে বিয়ে করেন। বেশ ছিলেন। বছর পনের আগে একটু করে পাগলামির লক্ষণ দেখা গেল। তারপর একেবারে পাগল হয়ে গেলেন।

উত্তেজনা চেপে বললাম—আপনার বাবার নাম কি দেবীবাবু ?

নীতা অবাক হয়ে বলল—আপনি চেনেন ? কোথায় দেখেছেন বাবাকে ?

—দেখিনি। নাম শুনেছি। ফ্রিডম ফাইটারদের বইয়ে সম্ভবত।

নদীর ধারে এসে পৌঁছেছি ততক্ষণে। নীতা ব্যাকুলভাবে বলল—আপনি বিলুর কথা বিশ্বাস করেলেন ?

—বিলুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বা আছে। বিলু কেন বিয়ে করেনি আপনাকে ?

—হঠাৎ আমার বিয়ে হয়ে যায়। তখন আমি কলকাতায় মামার বাড়িতে আছি। বিলু জানত না। পরে জানতে পেরে রেগে

গিয়েছিল। কিন্তু আমার তো কিছু করার ছিল না। বিয়ের পর এই প্রথম এতদিনে কুমারচকে আসা হলো আমার। জানতাম না হঠাৎ আমার স্বামী এখানে নিয়ে আসবে।

—বিলু কী করে খবর পেল আপনি এসেছেন?

—ভোরে আমার স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি ভোলাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। ভোলা আমাকে ছেলেবেলায় দেখে থাকবে। তবে চিনতে পারেনি। তাই ওকে টাকা দিয়ে গোপনে পাঠিয়েছিলাম।

—আপনার গোপন কথাটা বলতে আপত্তি থাকলে শুনব না। তো—

—আপত্তি নেই জয়ন্তবাবু। আমি স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ওকে ডেকেছিলাম। বিলু দুর্ধর্ষ ছেলে। আমার বিশ্বাস ছিল, ও আমাকে এই বাস্টার্ডটার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যে শয়তানের হাতে আমি পড়েছি, সে যে কত ধূর্ত, তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। এখন আমার ভীষণ ভয় করছে। আপনি আমাকে বাঁচান জয়ন্তবাবু।

নীতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বললাম—সিনক্রিয়েট করবেন না। চলুন দেখি, আমার বৃদ্ধ সঙ্গী ভদ্রলোক ফিরেছেন কিনা। উনি একজন মস্তবড় ট্রাবলশুটার। মুশকিল আসানও বলতে পারেন।

ঢালু পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। পেছনের দিকে আচমকা হাসির শব্দ শুনে ঘুরে দেখি, স্বয়ং দাড়িওয়ালা মুশকিল আসান দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে বাইনোকুলার তখনও ধরা এবং বুকে ক্যামেরা ঝুলছে। পিঠের কিটব্যাগে প্রজাপতি-ধরা নেটের স্টক বেরিয়ে আছে। মাথার টুপিতে শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল আটকানো।

কাছে এসে বললেন—পুরো ঘটনাটি বাইনোকুলারে দেখেছি। হ্যাঁ—ভোজালিওয়ালা আততায়ীর ছবিও ক্যামেরায় ধরেছি। চিন্তা করো না ডার্লিং। স্তূপের মাথায় ঘাপটি পেতে বসে একটা ধূর্ত

প্রজাপতির ছবি তুলবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ দুই যুবক-যুবতীর কথাবার্তার শব্দ। তারপর—হ্যাঁ, আততায়ী আমার মাত্র কয়েক গজ নীচে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ক্যামেরা তো রেডি ছিল। ক্লিক করল। তবে একটা কথা জয়ন্ত! খামোকা গুলি খরচ করো না কখনো। লাইসেন্সড্ রিভলভারের গুলি খরচ করলে কৈফিয়ত দিতে হয় আইনত। পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হয় এমন কী ঘটেছিল যে তোমাকে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে।

ব্যস্তভাবে বললাম—কর্নেল ইনিই মিসেন সেন এবং সেই দেবীবাবুর মেয়ে।

কর্নেল হাসলেন।—বরকধঝ কচতটপ।

নীতা চমকে উঠল—আপনি জানেন?

কর্নেল আস্তে বললেন—হুঁ।...

পাঁচ

বাংলোয় গিয়ে সুকমল সেনের জিপগাড়ি দেখতে পেলাম না। ভোলা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। নীতাকে বলল—মেমসায়েব! বিলুবাবু শাসিয়ে গেল, আপনারা এখানে থাকলে বাংলো জ্বালিয়ে দেবে। বিশ্বাসবাবু এসেছিলেন। উনি থানায় খবর দিতে গেছেন। গার্ডরা এখন বাড়িতে গিয়ে ঘুমুচ্ছে। একটা কিছু হলে কে আটকাবে বুঝতে পারছি না।

কর্নেল নীতাকে বললেন—তুমি আমাদের রুমে গিয়ে বসো। বেরিও না। আর ভোলা! আমাদের ব্রেকফাস্ট দক্ষিণের বারান্দায় দিয়ে যাও। জয়ন্ত, কুইক! আমাদের রুমের দরজা খুলে দাও গে।

নীতাকে দরজা খুলে ঢুকিয়ে দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় বসলাম। ভোলা ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। কর্নেল আস্তেসুস্থে টুপি সাফ করলেন। একটা ব্রাশ ওঁর কিটব্যাগেই থাকে। তারপর তেমনি ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করলেন।

কাঠপাচার নিয়ে সেনসায়েবের সঙ্গে ঝন্টুবাবু, মানে শচীন মজুমদারের বিরোধ এবং পরে মিটমাটের যে ঘটনা নব মালীর কাছে শুনেছি, কর্নেলকে তা জানিয়ে দিলাম। কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। তখন বললাম—বাবার সঙ্গে মিটমাট। অথচ ছেলের সঙ্গে বিবাদ। ছেলেকে খুন করতে লোক পাঠিয়েছিল। এদিকে নীতা বলছিল, সে কিছুই জানে না। তার কথাবার্তায় অবিশ্বাস করার কিছু পেলাম না।

বলে নীতার কাছে তার জীবনকাহিনী যেটুকু শুনেছি, তার বিবরণ দিলাম। কর্নেল তবু কোনও মন্তব্য করলেন না।

বিরক্ত হয়ে বললাম—কী মনে হচ্ছে বলবেন তো? আপনি তো মাঝে মাঝে দেওয়ালের ওপারে কী ঘটছে, তাও নাকি দেখতে পান। এখন পাচ্ছেন না?

কর্নেল ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছে দাড়ি ঝেড়ে কফির পট থেকে কফি ঢাললেন। তারপর বললেন—তুমি তো জানো জয়ন্ত, খাওয়ার সময় আমি কথা বলা পছন্দ করি না। বহুবার তোমাকে বলেছি এ কথা। এর তিনটে কারণ আছে, তাও বলেছি। এক : গলায় খাবার আটকে যেতে পারে। দুই : অমনোযোগীর পেটে খাদ্য হজম হয় না। তিন : খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

হেসে ফেললাম।—সরি! ভুলে গিয়েছিলাম। তো এবার বলুন, কেন বিলুবাবুকে সেনসায়েব খতম করতে চান! অর্থাৎ আপনার এ সম্পর্কে থিওরিটা কী?

কর্নেল প্রায় আগুনে জল ঢেলে নিভানোর মতো বললেন—সেনসায়েবই যে ওই লোকটাকে ভোজালির কোপ বসাতে পাঠিয়েছিলেন, তার মূল লক্ষ্য যে নীতাই ছিল না, তা-ই বা কী করে বলা যাবে? তবে এটা ঠিক, লক্ষ্য যদি নীতা হয়, তাহলে বিলুকেও তার হাতে মরতে হতো।

সায় দিতে বাধ্য হলাম।—ঠিক। কিন্তু বিলু কেন ভাবল সেনসায়েবই তাকে খুন করার জন্য বউকে টোপ করেছিলেন?

—এ থেকে শুধু এটুকুই বলা চলে, সেনসায়েব কেমন লোক, বিলু ভালোই জানে। তাছাড়া তার বাবার সঙ্গে একসময় সেনসায়েবের বিরোধ ছিল—তুমিই বললে। তাই বিলুর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, সেনসায়েব বাবার ওপর রাগ ছেলের ওপর ঝাড়তে চেয়েছেন। আরও একটা কথা। তার প্রেমিকাকে সেনসায়েবের মতো বয়স্ক লোক বিয়ে করেছেন। জয়ন্ত, যার ওপর রাগ থাকে, আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে।

—তাহলে আপনি বলতে চান বিলুর সন্দেহ ভুল ?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—আমি কিছুই বলতে চাই না। এই ঘটনা সম্পর্কে নিছক কিছু যুক্তিসম্মত প্রশ্ন তুলেছি। দ্যাট্‌স্ মাচ।

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে আঁচড় কাটতে থাকলেন। আমার দৃষ্টি গেটের দিকে। বিলু দলবল নিয়ে এসে হামলা করতে পারে। আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। কাজেই আমার বিশ্বাস, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠাতে পারব। আর তার আগে অনন্ত বিশ্বাস পুলিশ নিয়ে হাজির হলে তো ভালই। নীতা বেচারার জন্য আমার খারাপ লাগছে। ও জানে না ওর বদ্ধ পাগল বাবা এখন কলকাতায় পুলিশের হাজতে বন্দী।

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। হাঁক দিলেন—ভোলা।

ভোলা এসে সেলাম দিল।

—এগুলো নিয়ে যাও। আর শোনো. মেমসায়েব যে আমাদের রুমে আছেন, কাকেও বলো না। বললে তুমিই বিপদে পড়বে। বুঝতে পেরেছ ?

ভোলা ব্যস্তভাবে বলল—হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ, স্যার।

—সেনসায়েব এসে জিজ্ঞেস করলে বলবে, বিলুবাবুর সঙ্গে নদীর ওপারে যেতে দেখেছিলে—ফিরতে দেখনি মেমসায়েবকে, কেমন ?

—আজ্ঞে। তবে দেখবেন স্যার, আমি গরিব মানুষ। কোনও সাতে-পাঁচে থাকি না।

—মনে রেখো, যা বললাম। এসো জয়ন্ত।

কর্নেল ঘরে ঢুকলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলাম। কর্নেল দরজা ভেতর থেকে লক-আপ করে এয়ারকণ্ডিশনার চালিয়ে দিলেন। চেয়ারে বসে আছে নীতা। মাথা টেবিলে এবং খোঁপা খুলে চুল এলিয়ে পড়েছে : নিঃশব্দে কাঁদছে।

কর্নেল পাশের চেয়ারে বসে চাপা স্বরে বললেন—মনকে শক্ত করো নীতা। হাতে সময় কম। তোমার সেফটির দায়িত্ব আমার। ওঠো। সোজা হয়ে বসো। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাইছি তোমার কাছে।

নীতা আত্মসম্বরণ করে বলল—আপনি আমার বাবার মতো। আমাকে বাঁচান আপনি।

—তুমি দেবীবাবুর মেয়ে। তোমার বাবা বদ্ধ পাগল। নাম জিজ্ঞেস করলে বলেন, বরকধঝ কচতটপ। তাই না?

নীতা মাথা দোলাল শুধু।

—তোমার বাবা কোথায় আছেন জানো?

—চণ্ডীকাকা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বাবা এখানে শচীন-জেঠুদের উন্মাদ আশ্রমে আছেন। আমার স্বামী হঠাৎ গতকাল সকালে বলল, চলো। তোমার বাবাকে দেখে আসবে। তারপর এখানে এনে তুলল। আমি ভয় পেয়েছিলাম। হয়তো আমাকে এখানে পার্টি দিতে এনেছে। এবং আমাকে কাকেও অবলাইজ করতে হবে। বিলুকে চিঠি লিখে পাঠানোর এ-ও একটা কারণ। সুযোগটা ছাড়তে চাইনি।

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—গতরাতে তোমার স্বামী বাইরে বেরিয়ে ছিলেন কি?

—হ্যাঁ। কে দরজা নক করল? তখন বেরিয়েছিল? আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

—বাই দা বাই, তোমার স্বামী বিয়ের আগে তোমার বাবার অবস্থা জানতেন?

—হ্যাঁ। সবই জানত। আমার মামা ছিলেন কণ্ট্রাক্টার।

আমার স্বামী ছিল মামার উড সাপ্লায়ার।

আমি বলে উঠলাম—কাঠ সাপ্লাই করতেন ভদ্রলোক? এখনও তো তাই করেন। তাই না?

নীতা বলল—এখন কী করে, আমি বুঝতে পারি না। এখানে-ওখানে পার্টি দেয়। বলে, বিজনেস করছি। কী বিজনেস আমি জানি না। হি ইজ আ স্কাউণ্ড্রেল। আই হেট হিম্।

কর্নেল বললেন—বাই দা বাই, তুমি অমরেশ রায় নামে কাকেও চেনো?

নীতা একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল—নামটা চেনা মনে হচ্ছে।

—পরিতোষ লাহিড়ি নামে কাকেও চিনতে?

নীতা তাকাল। একটু পরে বলল—শুনেছি নামটা। মনে পড়ছে না।

—কলকাতায় তোমার মামার বাড়ি কোথায়?

—বাগবাজারে।

—নকুল মল্লিক লেনে নয় তো?

নীতা একটু অবাক হয়ে বলল—হ্যাঁ।

—ওখানে একটা ফ্রিডম-ফাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন আছে, জানো?

—লক্ষ্য করিনি।

—বিয়ের সময় তোমার স্বামী কোথায় থাকতেন?

—ওই পাড়াতেই। বিয়ের পর আমরা লেকটাউনে নতুন ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিলাম। এখন সেখানেই থাকি।

—তোমার স্বামী কি একা থাকতেন বিয়ের আগে?

—না। ওর মা ছিলেন। অসুস্থ মহিলা। লেকটাউনে গিয়ে মারা যান। ভদ্রমহিলা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। ওঁর কাছেই জানতে পেরেছিলাম, আমার স্বামীর একটা বউ ছিল। সেই মহিলা স্যুইসাইড করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছি, কেন সুইসাইড করেছিলেন। আর কিছুদিন পরে আমাকেও হয়তো তাই করতে হবে।

নীতা সেন আবার কেঁদে ফেলল। কর্ণেল বললেন—তুমি ভালোভাবে যাতে বেঁচে থাকো, আমি তার চেষ্টা করব। তোমার মামা বেঁচে আছেন?

—না। গত মাসে স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। মামার মৃত্যুর পর ওঁদের ফ্যামিলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমার আর আশ্রয় নেই কর্নেল সরকার।

—বাই দা বাই, কোনও মিনিস্টারের সঙ্গে মিঃ সেনের খাতির আছে জানো?

—হ্যাঁ। এখানকার লোক। প্রতাপ সিংহ নাম। কলকাতায় একটা পার্টিতে এসেছিলেন। ও আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মিনিস্টার আমার বাবাকে চেনেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবার কথা।

—আর একটা প্রশ্ন। তোমাদের ফ্ল্যাটে অমরেশ রায়ের লেখা 'বাংলার আগস্টবিপ্লব' নামে কোনও বই দেখেছ কখনও?

নীতা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওতে বাবার কথাও লেখা আছে। আমি পড়েছিলাম কিছুটা। পুরনো বই। ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় ছিল। আমার স্বামীই আমাকে দেখিয়েছিল বইটা। লেখকের নামের পাতা ছেঁড়া ছিল। কিন্তু প্রত্যেক পাতায় বইয়ের নাম লেখা ছিল।

—একসময় বইয়ের নাম প্রত্যেক পাতায় ছাপানো থাকত। আজকাল এই রীতি উঠে গেছে। বলে কর্নেল ঘুরলেন আমার দিকে —জয়ন্ত। বাইরে গাড়ির শব্দ শুনছি। সাবধানে বেরিয়ে গিয়ে দেখে এসো।

দরজা খুলে দেখি, গেটের ওধারে একটা পুলিশভ্যান থেকে চারজন বন্দুকধারী কনস্টেবল নামছে। তারপর নামলেন এক পুলিশ অফিসার এবং ফরেস্ট ডিপার্টের অনন্ত বিশ্বাস। আমি তখনই ঘরে ঢুকে পড়লাম। বললাম—পুলিশ! অনন্তবাবু বাংলো পাহারা দিতে এনেছেন মনে হলো।

নীতা কী বলতে যাচ্ছিল, কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন—চুপ!

কিছুক্ষণ পরে দরজায় নক হলো। কর্নেল ইশারায় নীতাকে বাথরুমে ঢুকতে বললেন। তারপর গিয়ে দরজা খুললেন।—কী ব্যাপার অনন্তবাবু? ভোলা বলল, কে নাকি বাংলোয় আগুন ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে গেছে।

অনন্তবাবুর কথা শোনা গেল—হ্যাঁ, স্যার! সেনসায়েব যতবার আসবেন, একটা না একটা ঝামেলা হবে। অথচ কিছু করার নেই। ওপর থেকে ইনস্ট্রাকশন আছে।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। আমিও বেরিয়ে গেলাম। বারান্দায় বেতের চেয়ারে ঠ্যাং তুলে বসে তরুণ বয়সী পুলিশের দারোগাবাবু জুতোয় বেটন ঠুকছিলেন। অনন্তবাবু বললেন—ছোটবাবু! ইনিই কর্নেলসায়েব। এঁর কথা বলছিলাম আপনাকে। আর ইনি জার্নালিস্ট।

ছোটবাবু ঠ্যাং নামিয়ে ভদ্রতা দেখালেন। বললেন—বসুন কর্নেলসায়েব! গল্প করা যাক। বিশ্বাস ক'কাপ চা পাঠিয়ে দিন। ওদেরও দেবেন।

কনস্টেবলরা বারান্দা দিয়ে বাংলো পরিক্রমা করছে। তাদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে ছোটবাবু আবার বললেন—আসুন কর্নেলসায়েব। বিশ্বাস বলছিল, আপনি নাকি পাখিটাখি দেখতে ভালোবাসেন। পাখিটাখিতে কী আছে বলুন তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—সন্ত জয়েন করেছেন?

—অ্যাঁ হ্যাঁ।

—ট্রেনিংয়ের পরই এই সাংঘাতিক জায়গায় পোস্টিং?

—সাংঘাতিক তো কিছু দেখছি না। আপনি দেখেছেন নাকি?

—দেখেছি।

—দেখেছেন? কী দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন?

—বরকধঝ-কচতটপ।

ছোটবাবু সোজা হয়ে বসলেন।—আর য়ু জোকিং উইদ মি? মাইণ্ড ছাট, আই অ্যাম অন ডিউটি।

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন।—সে কী! আপনি এখানকার

পাগলাগারদ—সরি! উন্মাদ আশ্রম দেখেননি?

—হোয়াট ডু য়ু মিন টু স্যে?

—এখানকার পাগলরা সাংঘাতিক। কাগজে বিজ্ঞাপন পড়েছি একজন খুনে পাগল পালিয়ে গেছে গরাদ ভেঙে! এটা তো আগে লোকাল পুলিশের জানার কথা। নাম জিজ্ঞেস করলে সে নাকি বলে বরকধঝ-কচতটপ।

তরুণ ছোটবাবু বাঁকা হাসলেন।—দেন য়ু আর দ্যাট ম্যান, আই থিংক্!

কর্নেল অট্টহাসি হেসে বললেন—ঠিক ধরেছেন। আমিই সে।

ছোটবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কর্নেল হোন আর যাই হোন মশাই, বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

অনন্তবাবু বিব্রতভাবে বললেন—প্লিজ ছোটবাবু! ইনি খুব বিখ্যাত মানুষ। এঁকে—

ছোটবাবু রাগী মুখে বললেন—বিখ্যাত হোন আর যা-ই হোন, ডিউটির সময় আমি জোক পছন্দ করি না।

বলে তিনি আগের মতোই বসলেন এবং টেবিলে ঠ্যাং তুলে দিলেন। কর্নেল ও আমি ঘরে ফিরে এলাম। বললাম—অদ্ভুত লোক তো! মফস্বলে অনেক জাঁদরেল দারোগাবাবু দেখেছি, এরকম কখনও দেখিনি।

কর্নেল হাসছিলেন। বললেন—একজন যথার্থ অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান টাইপ বলা চলে। আসলে আজকাল ইয়ংম্যানরা লেখাপড়া শিখে চাকরি জোটাতে পারছে না। দৈবাৎ জুটে গেলে কাজটা যদি ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, বেকার জীবনের ফ্রাস্ট্রেশন অবচেতনায় থেকে এক ধরনের ভায়োলেন্ট রিঅ্যাকশান সৃষ্টি করে।

—প্লিজ বস্, সাইকোলজি আওড়ালে আমার মাথা ধরে।

কর্নেল বাথরুমের দরজায় নক করে আস্তে বললেন—নীতা! বেরিয়ে এসো।

কোনও সাড়া এল না। চমকে উঠেছিলাম। ঝোঁকের বশে বাথরুমে আত্মহত্যা করে বসেনি তো নীতা? সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে তা হলে।

কর্নেল দরজা টেনে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি দুরুদুরু বুকে উঁকি দিলাম ভেতরে। নীতা নেই। বাথরুমের একটা বাইরের দরজা আছে। সব বাংলোতে থাকে ওটা। সুইপার ঢোকার দরজা। কর্নেল সেদিকে আঙুল তুলে বললেন—নীতা এই দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।

সেই দরজার বাইরে ছাইগাদা, আবর্জনার ডাঁই আর আগাছার ঝোপ। এদিক দিয়ে কেউ গেলে কারও নজরে পড়ার কথা নয়। ঝাউ, ক্যাকটাস, লতাগুল্মের জঙ্গল। বোগানভিলিয়ার প্রকাণ্ড ঝোপ, ফুলে লাল হয়ে আছে। কর্নেল শ্বাস ফেলে বললেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দরজা এঁটে বললাম—পালিয়ে গেছে নীতা। ভারি অদ্ভুত তো! পাকা অভিনেত্রী বোঝা যাচ্ছে।

কর্নেল আস্তে বললেন—হুঁ। পালিয়ে গেছে। তবে এ পালানো কি ওর বর্তমান জীবন থেকে, নাকি···

কর্নেল কথা শেষ করলেন না। মেঝে থেকে এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিলেন। কাগজটার ওপর আমারই দাড়িকাটা ব্রাশ চাপানো। ব্রাশটা কর্নেল আমাকে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ব্রাশটা ঝটপট বেসিনে রগড়ে ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুছে ঘরে গেলাম। দেখলাম, কর্নেল কাগজের টুকরোটা খুঁটিয়ে পড়ছেন।

আমাকে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখ।

কাগজের টুকরোতে লেখা আছে: ক্ষমা করবেন। এরপর আর আমার এখানে থাকা চলে না। আমাকে চলে যেতেই হতো। এই সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। ইতি—

হতভাগিনী নীতা

টেবিলে কর্নেলের সেই ছোট্ট প্যাডটা পড়ে আছে। সেটা ছিঁড়ে

কর্নেলেরই কলমে লেখা চিঠি। আঁকাবাঁকা বড়-বড় হরফে লেখা। কর্নেলকে ফেরত দিয়ে বললাম—ওদের ঘরের চাবি নিশ্চয় ওর কাছে ছিল। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারত। এভাবে নাটক করে ব্যাকডোর দিয়ে পালাল কেন সেনসায়েবের মেমসায়েব? নিজের ঘরে ঢুকতে অসুবিধা কী ছিল?

কর্নেল মাথা দোলালেন।—রিস্ক নিতে চায়নি। যে কোনও মুহূর্তে সেনসায়েব এসে পড়তে পারেন ভেবেছিল। কিংবা ধরো—যা বলছিলাম একটু আগে—নিজের বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে গেছে।

—বাপ্‌স্! এই বয়সেও আপনি তুখোড় রোমান্টিক।

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যাঁ। আমি প্রচণ্ড রোমান্টিক। রোমান্টিক বলেই প্রকৃতি এবং মানুষের কাজে রহস্য টের পেলে মেতে উঠি। যাই হোক, ভোলাকে খবর দাও। বারোটায় লাঞ্চ খাব। শোনো! ভোলাকে নীতা সম্পর্কে কোনও কথা বলবে না।...

বাংলো থেকে বেরুনোর সময় দেখলাম, সেই ছোটবাবু নেই। বন্দুকধারী চার কনস্টেবল লনের ওদিকে গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে বসে গল্প করছে। কেউ খৈনি ডলছে। কেউ সিগারেট টানছে। সেনসায়েবের জিপটা নেই। পুলিশভ্যানও নেই।

কর্নেলের সঙ্গে যাওয়া মানেই আফ্রিকান সাফারি। বনবাদাড় ভেঙে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন কে জানে। মাঝে মাঝে বাইনোকুলারে পাখি-টাখি খুঁজছেন। কখনও প্রজাপতি দেখেই থমকে দাঁড়াচ্ছেন। অবশেষে একটা পিচরাস্তায় পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম—আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?

—কুমারচক।

—আর কতদূর?

—বাঁক ঘুরেই দেখতে পাবে। এটা স্টেশনরোড।

অবশ্য রাস্তায় বাস-ট্রাক-টেম্পো-সাইকেল রিকশা আর মানুষ-

জনের আনাগোনা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কাছাকাছি জনবসতি আছে। বাঁকে পৌঁছে সাইকেল রিকশা নিলেন কর্নেল। রিকশাওলাকে বললেন—মিনিস্টার প্রতাপ সিংহের বাড়ি চেনো ?

—মিনিস্টার তো রোববারে মিটিং করে কলকাতা চলে গেলেন স্যার। বিকেলে এসেছিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে চলে গেলেন। এখানে উনি তো থাকেন না!

—আহা, ওর বাড়িটা চেনো কি ?

রিকশাওলার সামনের একটা দাঁত ভাঙা। পানে ঠোঁট রাঙা। অমায়িক হাবভাব। বলল—বাড়ি মানে রাজবাড়ির কথা বলছেন ? ওনারা এখানকার রাজা ছিলেন শুনেছি। বাড়িটা আছে। তবে কলেজ হয়েছে। আপনি কলেজে যাবেন তো ?

—মিনিস্টার এসে ওঠেন কোথায় ?

—নদীর ধারে ডাকবাংলায় ওঠেন। আমাদের রিকশাচালক সমিতি থেকে একবার পিটিশন নিয়ে গিয়েছিলাম। খুব উপকারী মানুষ স্যার! রাজাদের জন্যেই কুমারচকের এত উন্নতি। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল।

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন—সাবরেজেস্ট্রি অফিস চলো। চেনো তো ? দলিল রেজেস্ট্রি হয় যেখানে ?

—খুব চিনি।

মফস্বল শহর যেমন হয়। ঘিঞ্জি রাস্তা। ভিড়। দোকানপাট। কিছুক্ষণ পরে সরকারি অফিস এলাকায় পৌঁছুলাম। সাবরেজেস্ট্রি অফিসটা দোতলা। প্রাঙ্গণে একটা বটগাছ। দুধারে চালাঘরে ডিড-রাইটারদের ঘিরে ভিড়। প্রাঙ্গণেও জনারণ্য বলা চলে।

কর্নেল বললেন—ওহে রিকশাওলা। ডিড-রাইটার চণ্ডীবাবুকে চেনো ?

রিকশাওলা বলল—খুব চিনি। ডেকে দেব স্যার ?

বখশিসের লোভ নিশ্চয় তার এই উৎসাহের কারণ। সে ভিড় ঠেলে প্রাঙ্গণে এগিয়ে গেল একটা চালাঘরের দিকে। একটু পরে

ফিরে এসে বলল—আধঘণ্টা আগে চণ্ডীবাবু বাড়ি চলে গেছেন স্যার! বাড়ি থেকে অসুখের খবর এসেছিল।

—ওঁর বাড়ি চেনো?

—হুঁউ। চলুন। নিয়ে যাচ্ছি। তবে বাড়ি অব্দি রিকশা যাবে না। একটুখানি হাঁটতে হবে।

রিকশাওলা আমাদের আরও ঘিঞ্জি একটা গলির মুখে নামিয়ে দিল। হাত দু-তিন চওড়া একটা গলি দেখিয়ে বলল সে—চলুন।

তার সঙ্গে সেই দম আটকে-যাওয়া গলির ভেতর ঢুকলাম আমরা। সামনে একটা পুরনো শিবমন্দিরে গিয়ে গলিটা শেষ হয়েছে। বাঁদিকে একটা একতলা জীর্ণ বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে রিকশাওলা ডাকাডাকি শুরু করল। দরজা খুলে বেরুলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। খালি গা, পরনে নীল লুঙ্গি। মুখে যেমন লম্বা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি, মাথায় তেমনি লম্বা সন্ন্যাসীচুল। কর্নেলকে দেখে তাকিয়ে রইলেন। কর্নেল নমস্কার করে বললেন—আপনি চণ্ডীবাবু?

—আজ্ঞে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন স্যার?

—কলকাতা। বলে কর্নেল রিকশাওলার দিকে ঘুরলেন।—তুমি অপেক্ষা করো। আমরা এখনই ফিরে যাব।

রিকশাওলা চলে গেলে চণ্ডীবাবু বললেন—বলুন স্যার!

—সাবরেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে শুনলাম আপনি বাড়ি চলে এসেছেন। কেউ অসুস্থ নাকি?

—আজ্ঞে আমার ওয়াইফ। প্রেশারের রুগী।

—এখন কেমন আছেন?

—ভাল। তা…

—দেবীবাবু আপনার দাদা?

—আজ্ঞে? চণ্ডীবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর সামলে নিয়ে বললেন—দূরসম্পর্কের দাদা। পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। শেষে এখানে উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি করলাম। শুনেছি কী করে সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন। কোনও—মানে, খারাপ

চণ্ডীবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন—আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার।

—পারছেন। বলেই কর্নেল হাঁটতে শুরু করলেন।

গলির শেষ প্রান্তে গিয়ে ঘুরে দেখি, তখনও চণ্ডীবাবু তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। কর্নেল রিকশায় উঠে বললেন—এবার আমরা উন্মাদ আশ্রমে যাব। চেনো তো হে?

রিকশাওয়ালা একই সুরে বলল—খুব চিনি। চলুন না স্যার যেখানে যাবেন।···

ছয়

রিকশায় আসতে আসতে কর্নেল আমাকে খবরের কাগজে উন্মাদ আশ্রম সম্পর্কে রিপোর্ট লেখার পূর্ব-পরিকল্পনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। বসতি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে নদীর ধারে 'কুমারচক উন্মাদ আশ্রম'। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ভেতরে-বাইরে উঁচু-নিচু গাছপালা। প্রকাণ্ড গেট। তার দুধারে কয়েকটা একতলা সারবন্দি ঘর। রিকশাওলাকে তার দাবিমতো ভাড়াসহ বখশিস মিটিয়ে কর্নেল বললেন—আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কখন ফিরব, ঠিক নেই।

রিকশাওলাকে এই কথাটা বলার কারণ, সে সারাপথ ঘ্যানঘ্যান করছিল, স্টেশনে সন্ধ্যার ট্রেন ধরিয়ে দিতে পারবে এবং স্টেশনে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা তার জানা।

বেজার মুখে সে চলে গেল। এলাকাটা নিরিবিলি সুনসান। গেটে বাইরে থেকে তালাবন্ধ। বাঁদিকে বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক সিগারেট টানছিলেন। দৃষ্টি আমাদের দিকে। আমরা তাঁর কাছে গেলে গম্ভীর মুখে বললেন—আলুমটর চটরপটর কাঁচকলা কানমলা···ইটকেল বিটকেল পাটকেল থুঃ!

খবর আছে নাকি স্যার ?

—খারাপ বলতেও পারেন। কলকাতায় দুজন লোককে খুনের দায়ে পুলিশ ওঁকে ধরেছে।

চণ্ডীবাবু হাত নেড়ে বললেন—মিথ্যা ! একেবারে মিথ্যা। হতেই পারে না। দেবীদা মানুষ খুন করতে পারেন ? গায়ে এককোঁটা জোর নেই।

—ওঁর মেয়ে নীতার খবর জানেন ?

চণ্ডীবাবু স্পষ্টত চমকে উঠলেন।—নীতা ? আজ্ঞে সে তো কলকাতায় থাকে। বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি। আমার সঙ্গে বহু বছর আর তার দেখাসাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই। নীতার কী হয়েছে স্যার ?

—কিছু না। দেবীবাবুর নিজের বাড়ি ছিল তো এখানে ?

চণ্ডীবাবুর মুখ সাদা দেখাচ্ছিল। বললেন—এই বাড়ির একটা অংশ ছিল দেবীদার। বউদি মরার পর আমাকে বেচে দিয়েছিল। তখন সুস্থ মানুষ। বেচে দিয়ে কলকাতায় মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। নীতার মামা বড়লোক। তার কাছে মেয়েকে রেখেছিল। তারপর এখানে ফিরে এল। তখন দেখি পাগল। শচীন মজুমদার ওনার বন্ধু। তার বাড়িতে থাকত। কখনও আমার কাছে এসেও থাকত। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে লোক। ব্রিটিশ আমলে জেল খেটেছিল। কোথায়-কোথায় ঘুরত সবসময়।

কর্নেল আস্তে বললেন—চণ্ডীবাবু। নীতা যদি আপনার কাছে এসে থাকে, তাকে লুকিয়ে রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে। শচীনবাবুর ছেলে বিলু ওকে মার্ডার করতে পারে। আবার নীতার স্বামীও হয়তো—

—আপনারা কি পুলিশ থেকে আসছেন স্যার ?

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে যদি নীতার স্বামীর কোনও সম্পর্ক থাকে, তবে সাবধান। তার ছায়া মাড়াবেন না।

অমনি ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে ছুরি। বলল—এখনও তুমি যাওনি?

ছুরি উঁচিয়ে আসতেই ভদ্রলোক নীচে লাফ দিয়ে পড়লেন। 'বাঁচাও! বাঁচাও! খুন করলে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে উধাও হয়ে গেলেন। লোকটা হাসতে হাসতে ঘুরেই আমাদের দেখতে পেল। বলল—আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

কর্নেলের পরামর্শমতো বললাম—আমরা আসছি কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকে। আশ্রমের সেক্রেটারি শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—একটু বসতে হবে তা হলে। উনি চারটে নাগাদ আসেন।

পাশের ঘরটা ওয়েটিং রুম গোছের। পরিচ্ছন্ন এবং সোফাসেটে সাজানো। কয়েকটা বুককেস আছে। দেয়ালে বিখ্যাত নেতাদের ছবির সঙ্গে সম্ভবত স্থানীয় স্বাধীনতাসংগ্রামীদের ছবি। লোকটি আমাদের বসিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে চলে গেল। কর্নেল ঘুরে-ঘুরে ছবিগুলো দেখছিলেন। তারপর দেখি, উনি ক্যামেরায় ছবি তুলতে শুরু করেছেন।

এই সময় ধুতি পাঞ্জাবিপরা এক প্রবীণ ভদ্রলোক এলেন—আপনারা নিউজপেপার থেকে আসছেন?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলে আমার আইডেন্টিটিকার্ডটা ঝটপট বের করে ওঁকে দেখালাম। উনি বললেন—হ্যাঁ। প্রতাপ বলছিল, কাগজের লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। আমাদের পাবলিসিটি দরকার। এ যুগে পাবলিসিটি ছাড়া কোনও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে পারে না।

—আপনিই কি সেক্রেটারি শচীনবাবু?

ভদ্রলোক হাসলেন।—না। আমার নাম গণেশ দেবনাথ। আমি কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। শচীনের আসার সময় হয়ে এল। বলে উনি কর্নেলের দিকে তাকালেন।—উনি আপনাদের ফোটোগ্রাফার?

কর্নেল নমস্কার করে সহাস্যে বললেন—বলতে পারেন। তবে

ফ্রিল্যান্স করি। সত্যসেবক দয়া করে আমার দু-একটা ছবি ছাপে-টাপে। আসলে ছবি তোলা আমার হবি।

গণেশবাবু ওঁর কথার ভঙ্গিতে হেসে আকুল হলেন। তারপর বললেন—বিখ্যাত নেতাদের ছবি তো সর্বত্র ফলাও করে ছাপা হয়। অথচ যাঁরা সত্যিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছেন, তাঁদের ছবি কেউ ছাপে না।

কর্নেল বললেন—এই ছবিগুলো কাদের, কাইণ্ডলি যদি পরিচয় করিয়ে দেন। জয়ন্ত, তুমি নোট করো! হ্যাঁ—এই যে দেখছি প্রদোষ অধিকারী, অমরেশ রায়, সত্যসাধন কুণ্ডু, পরিতোষ লাহিড়ি, দেবীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, শচীন্দ্র মজুমদার—হ্যাঁ, এই তো আপনারও ছবি আছে! আর এঁকে চিনতে পারছি। প্রতাপ সিংহ মিনিস্টার।

গণেশবাবু সগর্বে বললেন—আসলে কুমারচক এলাকায় ১৯৪২ সালের আগস্টবিপ্লবের বিপ্লবী আমরা। আমি, প্রতাপ আর শচীন্দ্র বেঁচেবর্তে আছি। আমরা তিনজন মাত্র সুস্থ শরীরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। বাকি যারা ছিল, কেউ জেলেই মারা পড়েছিল, কেউ ছাড়া পেল পাগল অবস্থায়, কেউ পরে পাগল হয়ে গেল। সে এক বিশাল ইতিহাস। স্বাধীনতাযুদ্ধের অলিখিত অজ্ঞাত অধ্যায়।

বললাম—অমরেশ রায়ের 'বাংলায় আগস্ট-বিপ্লব' বইটা পড়েছি।

—পড়েছেন? কোথায় পেলেন? গণেশবাবু নড়ে বসলেন।—বইটার কথা শুনেছিলাম। অমরেশ কলকাতায় গিয়ে বাড়ি-টাড়ি কিনেছিল। কোত্থেকে অত পয়সা পেয়েছিল কে জানে? নিজের পয়সায় বই ছেপেছিল। প্রথমে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য এই আশ্রম খুললাম আমরা, ও মাঝে মাঝে আসত। তারপর আশ্রম উঠে গেল। এই উন্মাদ আশ্রম করলাম।

বললাম—আপনাদের আশ্রমের প্রচারপুস্তিকা পড়েছি।

—পড়েছেন? তা তো পড়বেন। আপনারা জার্নালিস্ট। তো যা বলছিলাম, উন্মাদ আশ্রম করার পর অমরেশ এখানে আসা ছেড়ে দিল। কেন তা জানি না। তবে আশ্চর্য ব্যাপার! গত রোববার

কাগজে পড়লাম, কোন পাগলের হাতে খুন হয়ে গেছে। সেদিনই এখানে সংবর্ধনা সভায় ওর আসার কথা ছিল। তারপর আরও আশ্চর্য ব্যাপার, পরিতোষেরও আসার কথা ছিল। সে-ও নাকি পাগলের হাতে খুন হয়ে গেছে। সেই পাগলকে জানেন? ওই যে ছবি দেখছেন। দেবীপ্রসাদ! বদ্ধ পাগল অবস্থায় এখানে ভর্তি হয়েছিল। হঠাৎ গরাদ বেঁকিয়ে কী করে বের হয়ে গেল কে জানে! তারপর তার কাণ্ড দেখুন। দু-দুজন সহযোদ্ধাকে খুন করে ফেলল। তবে পালানোর পর ভেবেচিন্তে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে। কারণ দেবী একজন গার্ডকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল। তাই ওকে বাধ্য হয়ে সেলে ঢোকানো হয়েছিল। ডাণ্ডাবেড়িরও—

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন—দেবীবাবু কি না জানি না, একজন পাগলকে পুলিশ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে অ্যারেস্ট করেছে গতকাল। নাম জিজ্ঞেস করলে বলে---বরকধন্ম-কচতটপ।

গণেশবাবু লাফিয়ে উঠলেন।—দেবী! দেবী। ওকে তাহলে ধরেছে পুলিশ! কাগজে তো দেখলাম না আজ।

বললাম---আমরা কাগজের লোক। পুলিশসোর্সে খবর পেয়েছি। পরে বেরুবে খবর।

গণেশবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন---বাঁচা গেল। শচীন আসুক। জেনে খুশি হবে।

কর্নেল বললেন—দেবীবাবু একটা পদ্য আওড়ান শুনেছি আমরা। 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি—'

—হ্যাঁ পদ্যটা দেবীর খুব প্রিয় ছিল। বুঝলেন না? আসলে একজন বিপ্লবী তো। ব্রিটিশপুলিশের অত্যাচারের ধকল সামলাতে পারেনি। সুস্থ অবস্থায় জেল থেকে বেরুল। বিয়ে করল। আশ্রম থেকে আমরা ওর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল।

এই সময় চায়ের কেটলি এবং কয়েকটা কাপ নিয়ে সেই লোকটি ঢুকল। বলল—বড়বাবু খবর পাঠিয়েছেন আজ আসতে পারবেন না আপিসে।

গণেশবাবু বললেন—ঝন্টু আসবে না?

—আজ্ঞে। কেতো খবর দিয়ে গেল। লোকটি চাপাস্বরে বলল—বিলুবাবু কী ঝমেলা করেছে। পুলিশ তাকে ধরেছিল থানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। কেতো বলছিল। বলে লোকটি চলে গেল।

—ওই ছেলেই ঝন্টুকে ডোবাবে। বলে গণেশববু আমাদের দিকে ঘুরলেন।—শচীন আসবে না। চা খান আপনারা। তারপর আমিই আশ্রমের কাজকর্ম সম্পর্কে সব কথা বলব। একটু ভালভাবে লিখবেন যেন।

কর্নেল বললেন—আশ্রমের ভেতরটা দেখতে চাই আমরা। ছবি তুলতে চাই। আজকাল তো জানেন রঙিন ফোটোফিচারের যুগ।

চায়ে চুমুক দিয়ে গণেশবাবু বললেন—সব দেখাচ্ছি। যত ইচ্ছে ছবি তুলুন।

—দিনের আলো থাকতে থাকতে ছবি তুলতে হবে কিন্তু। আশ্রমের ভেতর গাছপালা আছে। ছায়া ঘন হলে কালার্ড ছবি ভাল আসবে না।

দ্রুত চা শেষ করে গণেশবাবু উঠলেন। হাঁকলেন—নিবারণ!

সেই লোকটি এল। গণেশবাবু বললেন—হসপিটালগেটের তালা খুলে দে। আমরা ওই গেট দিয়ে ঢুকব। আমরা ঢুকলে পরে আবার তালা আটকে দিবি। ওখানেই ওয়েট করবি বাবা। আমাদের যেন গারদে বন্দী করে রাখবি না। আসুন আমার সঙ্গে।

গণেশবাবু হাসতে হাসতে বেরুলেন। বড় গেটের ডানদিকের ঘরগুলো ডিসপেনসারি। এ-ঘর থেকে ও-ঘর করে গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে একটা করিডরে পৌঁছুলাম। সামনে ছোট গেট। মোটা লোহার গরাদ আঁটা। নিবারণ তালা খুলে দিল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে খোলা জায়গায় গেলাম। নিবারণ তালা এঁটে দিল। একটু অস্বস্তি হল আমার।

আশ্রমেরই পরিবেশ। ফুলবাগান। বড়-বড় গাছের গোড়ায়

বেদী। কোনও-কোনও বেদীতে কেউ শুয়ে আছে একটা ঠ্যাং তুলে। কেউ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে। ঘাসের ওপর একজন গড়াগড়ি খাচ্ছে আর হেসে অস্থির হচ্ছে। গণেশবাবু বললেন—মেণ্টাল পেশ্যাণ্ট। তবে পাগল বলা চলে না। ওই দেখুন, এদের ওপর নজর রাখার জন্য গার্ড আছে।

কর্নেল ছবি তুলছিলেন। গণেশবাবু সামনে বকবক করছিলেন। আমি 'নোট' নিচ্ছিলাম। একটা প্রতিমূর্তির কাছে গিয়ে গণেশবাবু বললেন—আমাদের পৃষ্ঠপোষক প্রতাপ সিংহের ঠাকুর্দা কুমার বাহাদুর মণীন্দ্র সিংহ। এঁর বাবা ছিলেন রাজা বিজয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ। ভেবে দেখুন। ব্রিটিশের অনুগত রাজপরিবারের বংশধররা পরে হয়ে উঠলেন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী! আশ্চর্য না?

সায় দিলাম। কর্নেল ছবি তুলতে তুলতে প্রতিমূর্তির পেছনে বোগানভিলিয়ার আড়ালে অদৃশ্য হলেন। গণেশবাবু খেয়াল করেননি। আবার বকবকানি শুরু হলো। বোগানভিলিয়ার ঝোপ পেরিয়ে গিয়ে কর্নেলকে দেখতে পেলাম না। বললাম—আপনাদের গারদ কোথায়? মানে—যেখানে বিপজ্জনক উন্মাদদের রাখা হয়?

—ওই তো। গণেশবাবু বাঁদিকে কয়েকটা সারবন্দি একতলা ঘর দেখিয়ে দিলেন। বারান্দা আছে সামনে। তারপর গরাদের সারি। ভেতরটা আঁধার দেখাচ্ছে দূর থেকে।

কর্নেলকে বারান্দায় দেখতে পেয়ে গণেশবাবু হাসলেন।—আপনাদের ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক অলরেডি হাজির। আচ্ছা, ভদ্রলোকের বয়স কত বলুন তো? একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। সাদা দাড়ি। অথচ দিব্যি শক্তসমর্থ মানুষ। শরীরচর্চা করতেন নাকি? আমিও একসময়—মানে, আমাদের সহযোদ্ধারা সকলেই একসময় শরীরচর্চা করতাম। বিপ্লব করতে হলে সুস্বাস্থ্য চাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা উত্তম। নাকি মিসকোট করলাম? বয়স স্মৃতি নষ্ট করে। হ্যাঁ—'গীতার চেয়ে ফুটবল শ্রেষ্ঠ।'

হাসি চেপে বললাম—ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক সার্কাসের খেলোয়াড় ছিলেন একসময়।

—তা-ই! হাসতে হাসতে গণেশবাবু পা বাড়ালেন।—তে তিনজনকে গারদে রাখা হয়েছিল। একজনের কথা তো বলেছি—দেবীপ্রসাদ। আরেকজন গদাধর পাল। স্বাধীনতাসংগ্রামী। আমাদের প্রিয় গদাইদা। বড় কষ্ট হয় মনে জয়ন্তবাবু! কিন্তু উপায় নেই ইটপাটকেল ছুঁড়ে কেলেঙ্কারি করে। অগত্যা ওকে আটকাতে হলো।

—আরেকজন?

গণেশবাবু থমকে দাঁড়ালেন।—ঝণ্টু, মানে শচীন আজ সকালে বলছিল, কাল রাতে নাকি একজনকে গারদে ঢোকানো হয়েছে আমি তাকে দেখিনি। নিশ্চয় ডেঞ্জারাস হয়ে উঠেছিল কোনও রুগী চলুন, গিয়ে দেখি।

কর্নেল বারান্দা থেকে নেমে এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন—ছবি তোলা শেষ আপাতত। আমি ওই গাছতলায় গিয়ে বসি জয়ন্ত গিয়ে দেখ, ইন্টারভিউ নিতে পার নাকি!

বারান্দায় উঠেই আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। সামনেকা সেলের ভেতর কালিঝুলিমাখা ছেঁড়া শার্ট আর হাফপেন্টুল পা দাঁড়িয়ে আছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদে প্রিয় হালদারমশাই!

আমি কিছু বলার আগেই হালদারমশাই খি খি করে হে বললেন—বরকধঝ-কচতটপ! তারপর লম্ফঝম্ফ নেচে আওড়ালে —'ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? সে-ভয়ে কম্পি নয় আমার হৃদয়!' বরকধঝ-কচতটপ…বরকধঝ-কচতটপ…

সর্বনাশ! গোয়েন্দা ভদ্রলোক কি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

গণেশবাবু খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—এ যে দেখা দেবীপ্রসাদের এক জুড়ি। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো? অ্যাই! ে তুমি? নাম কী? দেবীকে চেনো তুমি?

পাশের সেলের পাগল গদাইবাবু গরাদ আঁকড়ে হুঙ্কার দিলেন—চো-ও-প শালা! কড়মড় করে মুণ্ডু চিবিয়ে খাব। চিনি না? ন্যাকামি হচ্ছে? দেবীশালাকে আমি চিনি না?

গণেশবাবু হালদারমশাইয়ের সামনে থেকে সরে গদাইবাবুর সামনে গেলেন।—কী গদাইদা? কেমন আছ? চিনতে পারছ তো আমাকে?

—চো-ও-প শালা! একবার কাছে আয়। তোর মুণ্ডু কড়মড় করে চিবিয়ে খাই! আয়, আয়!

হালদাবমশাই এই সুযোগে চোখ টিপে আমাকে ইশারায় কিছু বললেন। বুঝতে পারলাম না। গণেশবাবু তখন গদাইবাবুকে নিয়ে পড়েছেন।—গদাইদা! আমি গণেশ। তোমার ভালর জন্যই তোমাকে এভাবে রাখা হয়েছে।

গদাইবাবু গর্জন করলেন—চো-ও-প! তারপর দাঁত কিড়মিড় করে ভয় দেখাতে থাকলেন।

গণেশবাবু দুঃখিত মুখে বললেন—বুঝলেন জয়ন্তবাবু? এই গদাইদার নামে ব্রিটিশ সরকার হুলিয়া জারি করেছিল। জ্যান্ত বা মরা অবস্থায় ধরে দিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। মৌরী নদীর ব্রিজে মিলিটারি ট্রেন উল্টে দিয়েছিল যারা, গদাইদা তাদেরই একজন। আজ তার কী অবস্থা দেখুন!

বললাম—আপনি ছিলেন না সেই দলে?

—পরিকল্পনার সময় সঙ্গে ছিলাম। তবে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ছিলাম না। আমাদের হাতে খবর ছিল বার্মা ট্রেজারির সোনাদানা টাকাকড়ি থাকবে ট্রেনে। কিন্তু ট্রেনের সেই কামরাটা নাকি নদীতে পড়েছিল। খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—দেবীবাবু ঘটনাস্থলে ছিলেন?

—হ্যাঁ। দেবী, পরিতোষ, অমরেশ, গদাইদা আর ঝণ্টু ছিল। চলুন, যেতে যেতে বলছি। ঝণ্টুর কাছে শোনা কথা। ট্রেজারির মাল নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রতিমূর্তিটার কাছে গিয়ে কর্নেলকে দেখতে পেলাম না। বেলা পড়ে এসেছে। হালদারমশাইয়ের ব্যাপার দেখে ভড়কে গেছি। গণেশবাবুর কথায় কান নেই। হালদারমশাই পাগলাগারদে তা হলে সত্যি ঢুকলেন বা জোর করে তাঁকে ঢোকানো হলো! মারধর অত্যাচার ইলেকট্রিক শক—কত কী চলে শুনেছি পাগলদের ওপরে। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হলো না তেমন কিছু ঘটেছে।

গণেশবাবু বললেন—ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?

বেগতিক দেখে বললাম—পাখির ছবি তোলার ভীষণ বাতিক। আপনাদের আশ্রম এরিয়ায় প্রচুর পাখি আছে। কোথাও কোনও পাখির ছবি তুলেছেন হয়তো।

—গার্ডদের কারও পাল্লায় পড়লে খামোকা অপমানিত হবেন। ভুল হয়ে গেছে। গার্ডদের জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বলে গণেশবাবু হাঁক দিলেন—মধু! হারাধন! পরেশ! কেউ আছ নাকি এখানে?

কোনও সাড়া না পেয়ে গণেশবাবু হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দেখি, খাঁকি হাফপ্যান্ট-গেঞ্জিপরা কজন লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এবং কর্নেল তাদের দিকে ক্যামেরা তাক করে আছেন এবং ঘাসের ওপর তাস ছড়িয়ে পড়ে আছে। বোঝা যায়, গার্ডরা তাস খেলতে বসেছিল।

গণেশবাবু থমকে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

—দেখছেন কাণ্ড! এবার চলুন, হসপিট্যালের অবস্থা দেখবেন। পনেরটা বেড। দুজন সাইকিয়াট্রিস্ট এবং একজন জেনারেল ফিজি-শিয়ান আছেন। কেউ বেতন নেন না। প্রতাপ ব্যবস্থা করে দিয়েছে লোকাল গভর্মেন্ট হসপিট্যাল থেকে এসে ওঁরা ভলান্টারি সার্ভিস দেন।

—আশ্রমের রোগীরা কি সবাই ফ্রিডম-ফাইটার?

—হ্যাঁ। গভর্মেন্ট হসপিট্যালে মেন্টাল ওয়ার্ড আছে। কিন্তু আমরা শুধু ফ্রিডম-ফাইটার বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরই চিকিৎসা করি।

—আগে তো দুঃস্থ ফ্রিডম-ফাইটারদের আশ্রয়দান, সেবাযত্ন এ-সব করতেন শুনেছি। কিন্তু তারপর শুধু মানসিক রুগীদের জন্য আশ্রম করলেন কেন?

গণেশবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন—শচীনের আইডিয়া। কেন? কাজটা কি ঠিক হয়নি?

—না, না। একটা মহৎ কাজ।

—ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোককে ডাকুন এবার। অভ্যাসবশে ডেকে ফেললাম—কর্নেল!

গণেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওঁর নাম কর্নেল নাকি?

—না। মানে, আমরা ওঁকে ঠাট্টা করে ওই নামে ডাকি। ওঁর নাম এন সরকার।

কর্নেল এসে বললেন—জয়ন্ত, তোমার হয়েছে? এখনই না বেরুলে ট্রেন ফেল করব।

গণেশবাবু বললেন—কর্নেলবাবু! মেণ্টাল ওয়ার্ডের ছবি নেবেন চলুন।

—এই যাঃ! ফিল্ম তো শেষ। বলে কর্নেল ঘড়ি দেখলেন—সওয়া পাঁচটা বাজে। বাজার হয়ে কুমারচকের বিখ্যাত সরপুরিয়া নিয়ে যাব। সওয়া ছটায় ট্রেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

গণেশবাবু নিরাশ হয়ে বললেন—আচ্ছা।...

বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পৌঁছে বললাম—হালদারমশাইয়ের কীর্তি দেখলেন? বরাবর দেখছি, একটা-না একটা কেলেঙ্কারি বাধাবেনই। ওঁকে উদ্ধার করা দরকার ছিল।

কর্নেল হাসলেন—উদ্ধারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চিন্তা করো না।

—কিন্তু উনি পাগল সাজতে গেলেন কেন?

—আমারই পরামর্শে।

—খুব বিপজ্জনক পরামর্শ।

—একটু রিস্ক ছিল। কিন্তু আমি আসলে শচীনবাবুর রি-অ্যাকশন বুঝতে চেয়েছিলাম। এটা আমার একটা পরীক্ষা।

পরীক্ষায় পাস করেছি।

—কী পরীক্ষা?

—বরকধঝ-কচতটপ কোনও পুরনো রহস্যের চাবিকাঠি কিনা জানতে চেয়েছিলাম। এবার জানলাম ঠিক তা-ই। আরও জানলাম শচীনবাবু রহস্যের জট ছাড়াতে পারেননি। পারলে দেবীবাবুকে আটকে রেখে চাপ দিতেন না। দেবীবাবু ছিলেন শেষদিকের সেলে। সেলটা দেখে নিয়েছি। গরাদ বাঁকিয়ে পালানো অসম্ভব। কেউ গার্ডদের কাউকে কিংবা ওই নিবারণকে ঘুষ খাইয়ে ওঁকে নিয়ে পালিয়েছিল কলকাতায়। তারপর ওর সাহায্যে অমরেশ এবং পরিতোষ দুজনকেই খুন করেছে।

—খুনের মোটিভ কী?

—বরকধঝ-কচতটপ রহস্যের চাবিকাঠি সম্ভবত ওই দুজনই জানতেন। অমরেশবাবুর স্ত্রীকে লেখা চিঠির কথা মনে পড়ছে? দেখা করতে বলার উদ্দেশ্য ছিল সাংঘাতিক। অত্যাচার চালিয়ে গোপন কথাটি আদায় করা। দেবীবাবু, শচীনবাবু এবং খুনী যে ভাবে হোক, রহস্যটা জানত। কিন্তু জট ছাড়াতে পারেনি। দেবী-বাবু বদ্ধ পাগল। তাঁর কাছে গোপন কথাটি আদায় করা সম্ভব নয়। দেবীবাবুর গায়ে অত্যাচারের চিহ্ন আছে। অরিজিৎ বলছিল। কিন্তু অত্যাচার চালিয়েছিলেন আসলে শচীনবাবু! এরপর তো দেবীবাবু হাতছাড়া হয়ে গেলেন। তখন মিনিস্টারকে দিয়ে এখানে অমরেশ ও পরিতোষকে সভায় আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন শচীন-বাবু। স্বয়ং মিনিস্টার ওঁদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ায় ওঁরা আসতে রাজী হন। তখন খুনী দেখল, অবস্থা অন্যদিকে গড়াচ্ছে। শচীনবাবুর সঙ্গে ওদের রফা হওয়ার চান্স আছে। অতএব দেবী-বাবুকে দিয়ে উত্যক্ত করে বাইরে এনে পরপর দুজনকে খুন করল খুনী।

শিউরে উঠে বললাম—তা হলে শচীনবাবু হালদারমশাইয়ের ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন। আরও চালাবেন।

—নাহ্। হালদারমশাইয়ের সেলে গতরাতে শচীনবাবু ঢুকেছিলেন। হাতে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র ছিল। আমার পরামর্শ মতো হালদারমশাই সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে বলেন, 'Break the Jaw. Catch the Top.' 'বরকধঝ-কচতটপ।

—অ্যাঁ? বলেন কী!

—হ্যাঁ। ওটাই বরকধঝ-কচতটপ। ব্রেক দা জ, ক্যাচ দা টপ। 'জ' মানে চোয়াল। কিন্তু এর অন্য মানেও আছে—ন্যারো এন্ট্রান্স ডোর। সংকীর্ণ প্রবেশপথ। তা হলে দাঁড়াচ্ছে সংকীর্ণ প্রবেশপথ অর্থাৎ দরজা ভেঙে ওপরের জিনিসটা ধরো। বার্মা ট্রেজারির সেই সিন্দুকরহস্য।

অবাক হয়ে বললাম—আমিও তো বলেছিলাম এটা গুপ্তধন-রহস্য।

—যাই হোক। হালদারমশাই বললেন, কথাটা শুনে শচীনবাবু খুশি হন। হালদারমশাই তাঁকে পাগলামির ভঙ্গিতে বলেছেন, আজ রাত বারোটায় ওঁকে সেখানে নিয়ে যাবেন। ব্যস, ডিটেকটিভ ভদ্রলোক খুব আদরে আছেন এবং খুশিমতো পাগলামির অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি ফাঁদটা ভালই পেতেছি।

একটা খালি সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল রাস্তার মোড়ে। কর্নেল বললেন—শচীন মজুমদারের বাড়ি চেনো?

রিকশাওলা বলল—হ্যাঁ। কাছেই। ওই তো দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল বললেন—আচ্ছা, ওখান দিয়ে গেলে থানা দূরে পড়বে কি?

—তা একটু পড়বে।

—ঠিক আছে। চলো।

—দশ টাকা লাগবে স্যার!

—ঠিক আছে।

রিকশা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কর্নেল বললেন—থাক্। পরে দেখা করব'খন। থানার কাজটা সেরে নিই আগে।

রিকশা চলতে থাকল। বললাম—হঠাৎ মত বদলালেন যে?

কর্নেল বললেন—তোমাকে বরাবর বলেছি ডার্লিং, ভাল রিপোর্টার হতে চাইলে ভাল অবজার্ভার হওয়া দরকার। সেনসায়েবের জিপ দাঁড়িয়ে আছে শচীনবাবুর বাড়ির সামনে। নাম্বার ভোরবেলা টুকে রেখেছিলাম।

—সে কী! বিলু তো ওঁর ওপর খেপে আছে। হামলা করতে গিয়েছিল ফরেস্টবাংলোয়।

—বিলুর বাবার জিগরি দোস্ত। ব্যাপারটার রফা করতে এসে থাকবেন। বাবা যার রক্ষাকর্তা, ছেলে আর তার গায়ে হাত ওঠাবে না। নেহাত একটা ভুল বোঝাবুঝি বলে মিটে যাবে। বিলুর মতো ছেলের অনেক শত্রু থাকা সম্ভব নয় কি?

—যাই বলুন, ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।

—আমারও। কিন্তু কী আর করা যাবে? বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন।

একটু পরে বললাম—থানায় গিয়ে আবার সেই ছোটবাবুর পাল্লায় পড়লেই কেলেঙ্কারি। থানায় না গেলে নয়?

—চলো তো!

সরকারি এলাকায় পৌঁছে রিকশাওলা বলল—এটুকু হেঁটে যান স্যার। থানার সামনে আমি যাব না।

—কেন হে? থানাকে এত ভয় কিসের?

—আজ্ঞে স্যার! খামাকো ঝামেলা করে।

—নাকি তোমার লাইসেন্স নেই?

—লাইসেন আছে বৈকি স্যার! মালিকের নামে লাইসেন আছে। আমরা মালিকের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে প্যাসেঞ্জার খাটাই। পুলিশ সব জেনেও হাঙ্গামা করে।

—'প্যাসেঞ্জার খাটিয়ে' এই নাও দশ টাকা।

কর্নেল হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলেন।—মফস্বলে এলে আজকাল কতরকম অভিজ্ঞতা হয়। বলে বাইনোকুলারে কী দেখতে থাকলেন। বেলা পড়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে। এখন কী দেখছেন কে জানে!

বললাম—কী হলো ? চলুন।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—একটা শামুকখোল পাখি। ওদিকে একটা ঝিল আছে। এতদূরে চলে এসেছে পাখিটা। সাহস আছে বটে। চলো।

থানার উঁচু বারান্দা থেকে একজন অফিসার হন্তদন্ত নেমে এলেন। হ্যাণ্ডশেক করে বললেন—ডি আই জি সায়েবের মেসেজ পেয়েছি বেলা তুটোয়। ফরেস্টবাংলোয় গিয়ে শুনি, আপনি বেরিয়েছেন। এদিকে এক মস্তানকে নিয়ে আজ হাঙ্গামা। ফরেস্টবাংলোয় গিয়েছিল হামলা করতে—জাস্ট্ আমি চলে আসার পর। ওখানে আর্মড কনস্টেবল অলরেডি ছিল। তবু খবর পেয়ে আবার অফিসার আর ফোর্স পাঠালাম। আর বলবেন না কর্নেলসায়েব। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে !

কথা বলতে বলতে আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন উনি। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন।—অফিসার-ইন-চার্জ রমেন পালিত। জয়ন্তর কথা কি তোমাকে বলেছিলাম কখনও ? বলেছিলাম নিশ্চয়। ভুলে গেছ। দৈনিক সত্যসেবকের সাংবাদিক। যাই হোক, তুমি যে এখনও বদলি হওনি, এটাই আশ্চর্য ! মিনিস্টারের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলেছ নাকি ? কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন।

—আপনার আশীর্বাদ ! এক মিনিট। আপনি তো কফির ভক্ত। বাসা থেকে আনাচ্ছি।

কফির হুকুম দিয়ে রমেনবাবু একটা খাম বের করলেন।—রেডিও মেসেজ। আপনার জন্য। এটা নিয়েই গিয়েছিলাম বাংলোয়।

সেই ছোটবাবুর কথাটা বলতে ইচ্ছে করছিল। বললাম না। পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশকে কিছু বলতে নেই। কর্নেলেরই পরামর্শ এটা।···

সাত

পুলিশের জিপ কর্নেলের কথা মতো ফরেস্টবাংলোর কাছাকাছি আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল। শ'দুয়েক মিটার আমরা হেঁটে এলাম। কর্নেলকে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম—রেডিও মেসেজে কী আছে?

কর্নেল টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছিলেন। বললেন—দেবীবাবুর লোহার ডাণ্ডায় রক্তের চিহ্ন লেগে আছে। ওটাই মার্ডার উইপন।

চমকে উঠলাম।—তা হলে উনিই মার্ডারার? আপনার থিওরি যে উল্টে গেল।

—নাহ। দেবীবাবুর অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে আভাস পাওয়া গেছে, কেউ গত পরশু রোববার বিকেলে ডাণ্ডাটা ওঁকে প্রেজেন্ট করেছিল। সে খুব ভাল লোক। তা ছাড়া সে-ই নাকি ওঁকে পাগলাগারদ থেকে উদ্ধার করেছিল। কলকাতা নিয়ে গিয়েছিল গাড়ি চাপিয়ে। কাজেই আমার থিওরি পাকা।...

বাংলো কাল সন্ধ্যার মতো নিরিবিলি নিঝুম। পুলিশপাহারা নেই দেখে বুঝলাম, বিল্টুকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়ার পর সবকিছু মিটমাট হয়ে গেছে। আমাদের দেখে ভোলা হন্তদন্ত ছুটে এল। সে কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন—সব শুনেছি। তুমি কফি নিয়ে এসো।

কর্নেল ঘরে ঢুকে গেলেন। আমার বদ্ধ ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। আজ সন্ধ্যায় বাতাস উঠেছে জোরালো। চারদিকে রহস্যময় শনশন শব্দ। নব মালী এসে সেলাম দিল। তার দিকে তাকালে সে মুচকি

হাসল। বললাম—কী নব? হাসছ কেন?

—একটু আগে সেনসায়েব এসেছিলেন। মেমসায়ের কখন নাকি হাওয়া হয়ে গেছে। আমাদের খুব তম্বি করে চলে গেলেন। নব চাপা স্বরে বলল ফের—বিলুবাবুর সঙ্গেই বোধকরি কেটে পড়েছে কখন। ভোলাদা দেখে থাকবে। বলছে না। সেনসায়েব থানায় খবর দিতে গেলেন হয়তো। কিন্তু আর কি ফেরত পাবেন? বিলু-বাবুর হাতে যা যায়, আর তা ফেরত আসে না। বিলুবাবুর বাবার হাতে থানা-পুলিশ। শুনলাম, ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিয়েছে। ও! আপনারা যাওয়ার পর কী সাংঘাতিক ঝামেলা হলো, বলিনি।

কর্নেলের মতোই বললাম—সব শুনেছি।

—শুনেছেন? তা হলে তো আর কথাই নেই। বলে নব চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল বেরিয়ে এলেন। বললেন—জয়ন্ত, আপাতত ঘণ্টা দুয়েক বাথরুমে ঢোকা নিষিদ্ধ। ওটা এখন ডার্করুম। ফিল্ম-রোলটা ওয়াশ করতে দিয়ে এলাম। শীগগির প্রিন্ট দরকার। বাথরুমে যেতে চাইলে ভোলাকে বলো। স্টাফদের জন্য ওদিকে একটা বাথরুম আছে। যাবে নাকি?

—দরকার নেই। কিন্তু এখনই ছবির প্রিন্ট জরুরি হয়ে উঠল কেন বস্?

কর্নেল জবাব দিলেন না। টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। ভোলা কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল। বেতের টেবিলে রেখে কাঁচুমাচু মুখে বলল—একটু আগে সেনসাহেব এসেছিলেন। মেমসাহেব কোথায় গেলেন জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বলিনি কিছু। আপনি বারণ করেছিলেন। সেনসায়েব আমাদের বকাবকি করে চলে গেলেন আবার। পুলিশে খবর দিতে গেলেন। পুলিশ এসে আমাকে জেরা করলে বিপদ। কী বলব স্যার?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—পুলিশ আসবে না তোমাকে জেরা করতে।

ভোলা গাল চুলকে বলল—আমি শুধু ভাবছি মেমসায়েবের খাওয়াদাওয়া হয়নি—

—মেমসায়েব আমার ঘর থেকে পালিয়ে গেছে।

—সে কী স্যার! কী করে পালালেন?

—বাথরুমের ভেতরকার দরজা খুলে চলে গেছে। যাই হোক, এ নিয়ে তোমার চিন্তার কারণ নেই।

ভোলা চাপা স্বরে বলল—আমারই ভুল। মেমসায়েব আমাকে সকালে একটা চিঠি দিয়ে আসতে বলেছিল বিলুবাবুকে। আপনাকে না বলে অন্যায় করেছি স্যার।

—জানি। তুমি তোমার কাজ করো। রাত সাড়ে নটার মধ্যে ডিনার খাব।

ভোলা অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে চলে গেল কিচেনের দিকে। কর্নেল কফি খেতে খেতে চুরুট ধরালেন। বললাম—'ব্রেক দা জ, ক্যাচ্ দা টপ' যে 'বরকধঝ-কচতটপ', কী করে বুঝলেন তা আমাকে বলেন নি। অথচ কলকাতায় বসেই ওই জট ছাড়িয়ে হালদারমশাইকে এখানে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো কর্নেল?

কর্নেল হাসলেন।—তোমাকে চমকটা সময়মতো দিতে চেয়েছিলাম। সেই গোপন মিলিটারি রেকর্ডসংক্রান্ত বইয়ে পড়েছিলাম, ওই কথা দুটো রেঙ্গুনের ট্রেজারির সিন্দুক খোলার সূত্র। পড়তে পড়তে মাথায় এসে গেল, কথা দুটোর 'বরকধঝ-কচতটপ' হয়ে ওঠার চান্স আছে। কিন্তু ভেবে দেখ, নদীর জলে আছড়ে পড়া লাগেজ ভ্যান বা পার্শেল ভ্যান থেকে সিন্দুকটা খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া দরজা লক করা ছিল। জলের ভেতর ভ্যান কেটে বের করা সে মুহূর্তে অসম্ভব। লেফটেন্যান্ট কর্নেল টেডি স্যামসন কোর্টমার্শালের সময় স্বীকার করেছিলেন, ব্রিজ থেকে এক মাইল দূরে ট্রেনের গতি মন্থর হয়েছিল। আধমাইল আসার পর ট্রেন থেমে যায়। তখন উনি এবং গার্ড নেমে গিয়ে দেখেন, লাইনের

ওপর গাছের ডালপালা পড়ে আছে। ড্রাইভার দূর থেকে তা দেখতে পেয়েছিল। সে ভেবেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাছ ভেঙে পড়েছে লাইনের ওপর। তখনই সোলজারদের ডেকে সেগুলো সরানো হয়।···কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—অমরেশবাবুর বইয়ে লেখা আছে, ব্রিজের ওপর ফিসপ্লেট সরানোর জন্য সময় নিতে তাঁদেরই আরেকটা দল লাইনে ওই অবরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। এবার চিন্তা করে দেখ জয়ন্ত। গার্ডের লাগোয়া কামরার ভ্যানের মধ্যে ট্রেজারির সিন্দুক। এদিকে কিছুক্ষণের জন্য গার্ড বা টেডি স্যামসন সেখানে নেই। গার্ডের কামরায় সেন্ট্রি থাকলে সে-ও কৌতূহলবশে দেখতে যেতে পারে কী হয়েছে। সেই সুযোগে ভ্যানের লক ভেঙে সিন্দুক নামিয়ে নেওয়া কি অসম্ভব ছিল? অমরেশবাবুর বইয়ে 'সেই ভ্যান অন্বেষণে ছুটিয়া' কথাটা অসম্পূর্ণ। পরের পাতা নেই। আমার ধারণা, তখন ছুটে ওরা গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারপর খবর পান সিন্দুক ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে। ওই পাতাটা খুবই দরকার ছিল।

বললাম—আপনি বলছিলেন বরকধঝ কচতটপ-এর সঙ্গে মন্দিরের সম্পর্ক আছে।

—অমরেশবাবুর বইয়ে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর একটা মন্দিরের উল্লেখ আছে। ওটা ছিল বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। আজ সকালে নদীর ওপারে বটতলার কাছে যে স্তূপটায় আমি চেপেছিলাম ওটাই সেই মন্দির। হালদারমশাইকে বলেছি, শচীনবাবুকে ওখানে আজ রাত বারোটায় নিয়ে যাবেন। শচীনবাবু জানেন ওটাই ছিল তাঁদের আস্তানা। কাজেই তিনি দাঁও মারার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—'ব্রেক দা জ'। জ মানে আপনি বলছিলেন সংকীর্ণ প্রবেশপথ বা দরজা। একটা সিন্দুকের আবার দরজা হয় নাকি? ডালা থাকে সিন্দুকের।

কর্নেল বললেন—আক্ষরিক বাংলা অর্থ ধরছ কেন? ইংরেজি 'জ-র অর্থব্যঞ্জনা হলো অন্যরকম। সিন্দুকের ক্ষেত্রে 'জ' বলতে বোঝায় ওপরে ও নীচের জুড়ে থাকা একটা ছোট্ট অংশ। মানুষের

মুখের ওপরকার এবং নীচের চোয়াল যেমন জুড়ে থাকে এবং হাঁ করলে খুলে যায়। 'জ'-র আক্ষরিক অর্থ চোয়াল। এবার সিন্দুকের সেইরকম চোয়াল কল্পনা করো—যা 'ন্যারো এন্ট্রান্স'ও বলা চলে। বোঝা যাচ্ছে, এই সিন্দুকের ডালা অন্য ধরনের। 'জ' ভাঙার পর 'টপ' ধরতে হবে। বড়জোর বলা যায়, 'টপ' ধরলে সিন্দুকটা পুরো খোলা যাবে। 'টপ জিনিসটা কী, এখনও অবশ্য জানি না।

এইসময় বাঁদিকে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ির আলো দেখা গেল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—এসো। ঘরে ঢুকে পড়ি। সেনসায়েব আসছেন মনে হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডায় আরাম পেলাম। এয়ারকণ্ডিশনার চালু ছিল। কর্নেল বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। আমি ঘামে ভেজা পোশাক বদলে নিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। বললেন —চমৎকার ডেভলাপ হয়েছে। দেখা যাক প্রিন্টগুলো কেমন হয়। পোর্টেবল ফোটো ওয়াশিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং সরঞ্জাম সঙ্গে থাকলে কত সুবিধে হয়। পোলারয়েড ক্যামেরা বেরিয়েছে আজকাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট বেরিয়ে আসে। কিন্তু ছবি শীগগির নষ্ট হয়ে যায়।

বললাম—সত্যি সেনসায়েবের গাড়ি এল কিনা বেরিয়ে দেখব নাকি?

—নাহ। ওর মুড খারাপ। চুপচাপ বসে থাকো। বরং বিছানায় লম্বা হও। খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে। বিশ্রাম করে তৈরি হয়ে নাও। আজ রাতদুপুরে সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চার......

রাত এগারোটা নাগাদ আমাদের ঘরের দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল গিয়ে দরজা খুললেন। ভোলার সাড়া পেলাম। গতরাতে বনরক্ষী কাশেমের সঙ্গে ভোলার গোপন সম্পর্ক আঁচ করার ফলে ভোলাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তাই কর্নেলের

বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে গেলাম।

ভোলা চাপাস্বরে বলছিল—কিছুক্ষণ আগে সেনসায়েব নদীর ঘাটের দিকের গেট খুলে দিতে বললেন। ওনার সঙ্গে কাশেম ছিল। দুজনে চলে যাওয়ার পর মেমসায়েব এসেছেন।

কর্নেল পাশের ঘরের দরজার দিকে এগোচ্ছেন, দরজা খুলে নীতা বেরুল। ওর হাতে একটা স্যুটকেস। কর্নেলকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। কর্নেল বললেন—তোমার জিনিসপত্র নিতে এসেছ। হুঁ আমি জানতাম তুমি আসবে। তাই ভোলাকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলাম। তোমার চণ্ডীকাকা কোথায়?

নীতা ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। নতমুখে বলল—রাস্তায় অপেক্ষা করছেন।

কর্নেল হাসলেন।—আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। রাত্রে সেনসায়েব বেরুবেন, তোমার চণ্ডীকাকা জানতেন।

—আমি চলি।

—এক মিনিট। অমরেশ রায়ের লেখা বইটা তুমি আমাকে দিয়ে যাও। আমি জানি, সেনসায়েবের কাছে বইটা ছিল। তোমার চণ্ডীকাকা সেই বইটা খুঁজে নিয়ে যেতে বলেছেন। তুমি সেটাও নিয়ে যাচ্ছ।

নীতা ফুঁসে উঠল।—বইটা চণ্ডীকাকারই। কাকা বলেছেন। বইটার পাতায় নাকি কাকার নামও লেখা আছে।

—না। চণ্ডীবাবুই টাকার লোভে বইটা তোমার বাবার কাছ থেকে হাতিয়ে সেনসায়েবকে দিয়েছিলেন। কর্নেল এক পা এগিয়ে ফের বললেন—এতদিনে চণ্ডীবাবু আঁচ করেছেন বইয়ে কী আছে। কিন্তু বইটা না দিয়ে গেলে তোমার যাওয়া হবে না, নীতা! তোমার ভালর জন্য বলছি। সিন ক্রিয়েট কোরো না। তোমার চণ্ডীকাকা একটা সাংঘাতিক রিস্ক নিচ্ছেন। ওকে সাবধান করে দিও।

নীতা একটু ইতস্তত করে কাঁধে ঝোলানো তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে

একটা বই বের করল। কর্নেলের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলল
তারপর হনহন করে নেমে গেল লনে। একটু পরে তাকে ছায়
আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখলাম।

কর্নেল বইটা কুড়িয়ে নিলেন। বইটা বাঁধানো। কিন্তু জরাজী
বাঁধাই। ভোলা বলে উঠল—ওই যাঃ! চাবি দিয়ে গেলেন
মেমসায়েব!

কর্নেল বললেন—ওই দেখ, রুমালের গিটে বাঁধা চাবি ঝুলে
লকে। হকচকিয়ে গিয়ে রুমালটাও ফেলে গেল নীতা। জয়
রুমালটা তুমি রাখো। ফেরার সময় সুযোগ পেলে উপহার দি
যাবে নীতাকে। ভোলা! তোমার ছুটি। গিয়ে শুয়ে পড়ো।

কর্নেল হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। ভোলা চাবিটা খুলে সত্যি
সত্যি রুমালটা আমাকে দিতে এল। বললাম—তুমি রাখো!

ভোলা মুচকি হেসে বলল—রুমের ডুবলিকেট চাবি আমাদে
কাছেই থাকে স্যার! কিন্তু সেনসায়েব কাল রাত্তিরে সেটাও চে
নিয়েছিলেন। মেমসায়েবের কাছে নাকি একটা চাবি থাকা দরকার
ওনার কথা অমান্য করতে পারি? তবে ব্যাপারটা কিছু বোঝ
যাচ্ছে না।

কর্নেল দরজার ফাঁকে মুখ বের করে বললেন—ভোলা!
পড়ো গে। জয়ন্ত! চলে এসো! রুমালটা কৈ? রুমালটা নি
এসো জয়ন্ত!

অগত্যা রুমালটা ভোলার কাছ থেকে নিতে হলো। ভোলা চ
গেল বাংলোর পিছনে তার কোয়ার্টারের দিকে। ঘরে ঢুকে দেখি
বৃদ্ধ রহস্যভেদী বইটা খুলে ঝুঁকে পড়েছেন। বললেন—হারানো
১৩৩-১৩৪ পাতা এই বইয়ে বহাল তবিয়তে আছে। তবে হাতে সম
কম। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরুতে হবে।

—কী আছে ওই দুটো পাতায়?

—সংক্ষেপে বলছি। কর্নেল বইটা ওর কিটব্যাগে ঢুকিয়ে উঠে
দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখে বললেন—অমরেশবাবুরা জলে নামে

চ্ছিলেন, সেইসময় দেবীপ্রসাদ এসে ওদের খবর দেন, সিন্দুক
স্তগত হয়েছে। একজন গোরা সেন্টি্রগার্ডের কামরায় ছিল। সে
মার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করেছেন ওঁরা। তার গলায় ছুরি
কিয়ে গার্ডের কামরায় টেডি স্যামসনের ফোলিও ব্যাগের সন্ধান
ান। ব্যাগে চাবি ছিল। ভ্যান খুলে ছোট্ট সিন্দুকটা খুঁজে বের
রতে সময় লাগেনি। সিন্দুক নিয়ে বিপ্লবীরা জঙ্গলে ঢোকেন।
বীপ্রসাদ সেন্ট্রর পিঠে তখনও বসে আছেন। হাতে ছুরি। তাঁকে
নি তখনও জেরা করছেন, সিন্দুকের চাবি ভ্যানের চাবির সঙ্গে
াছে কিনা। সেন্ট্র বারবার বলছে, 'বরকধঝ-কচতটপ।' দেবীবাবু
াবর ওইরকম গোঁয়ার এবং অপ্রকৃতিস্থচিত্ত মানুষ ছিলেন।
রিতোষ লাহিড়ি ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দৌড়ে এসে দেবীপ্রসাদকে
নে নিয়ে যান। যাবার আগে দেবীপ্রসাদ সেন্ট্রকে খুন করেছিলেন
াশ্চর্য ব্যাপার, টেডি স্যামসন কিন্তু কোর্টমার্শালের সময় সেন্ট্রর
ত্যাকাণ্ড বেমালুম চেপে যান। সম্ভবত নিজেকে শাস্তি থেকে
চাতেই। কারণ ওঁর গার্ডের কামরা ছেড়ে ছুটে যাওয়া উচিত
ল না। যাই হোক, অমরেশের তথ্য অনুসারে গার্ড ছিলেন বাঙালি
বং তিনিই ছিলেন বিপ্লবীদের ইনফরমার

—সিন্দুক সম্পর্কে আর কী লিখেছেন অমরেশবাবু ?

—ইস্পাতের চাদরে মোড়া সিন্দুক অনেক চেষ্টা করেও খোলা
ায়নি। তখন ওটা মন্দিরের কাছে পুঁতে রাখা হয়। পরদিন তো
লাকা জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় এবং মিলিটারি নামিয়ে কম্বিং
পারেশন শুরু হয়। সবাই নানা জায়গায় ধরা পড়েন। এদিকে
রদিন থেকে মৌরী নদীতে প্রবল বন্যা। যাই হোক, বহু বছর পরে
জল থেকে বেরিয়ে আর কেউ জায়গাটি খুঁজে বের করতে পারেন
ি। কারণ বছরের পর বছর বন্যা হয়েছে। জঙ্গল ঘন হয়েছে। ভাঙা
ন্দির আরও ভেঙে বন্যার স্রোতে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে। এবার
মরেশের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশটা বলি। একদিন পরিতোষ ওঁকে
লেন, সেন্ট্রির কথাটা 'বরকধঝ-কচতটপ' নয়। সম্ভবত Break

the Jaw, Catch the Top! কিন্তু বহুবার গিয়ে গোপনে খোঁড়াখুঁড়ি করে সিন্দুক খুঁজে পাননি ওঁরা। শেষবার গিয়েছিলেন গভীর রাতে। দুজনে একটা জায়গা পালাক্রমে খুঁড়ছেন। হঠাৎ সেখানে হাজির হন তাঁদের এক সহযোদ্ধা। তাঁর হাতে বন্দুক ছিল। গুলি ছুঁড়ে তাড়া করেন দুজনকে। অমরেশ চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু বইয়ে তাঁর নাম লেখেন নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সেই সহযোদ্ধার নাম শচীন মজুমদার। চলো! এবার বেরুনো যাক···

বাংলোর দক্ষিণের সদর গেট দিয়ে আমরা বেরুলাম। ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে মোড় নিলেন কর্নেল। একটু পরে নদীর ধারে পৌঁছলাম। এখানে বালির চড়া সমতল। তাই জলটা ছড়িয়ে গেছে। জুতোর তলা ভেজানো ঝিরঝিরে স্রোত মাত্র। ওপারে গিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে কর্নেল গুঁড়ি মেরে এগোলেন। ওঁকে অনুসরণ করছিলাম। হঠাৎ কানে এল, সামনে কোথাও কারা কথা বলছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর কানে এল।—Break the Jaw Catch the Top! বরকধঝ-কচতটপ।

কেউ বলল—শাট আপ! জায়গাটা দেখাও। নৈলে দেখছ তো হাতে কী আছে?

—ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? সে-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

—অ্যাই ব্যাটা! শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দে। ছাড়া পাবি। নৈলে পাগলামি ঘুচিয়ে দেব।

—দেবীদা জানে······দেবীদা জানে······দেবীদা জানে···

—তবে যে বলছিলি তুই জানিস?

—আমিও চিনি···আমিও চিনি···আমিও চিনি······

—চুপ! চিনিয়ে দে এক্ষুণি।

—খি খি খি! আগে সরপুরিয়া খাওয়াও! সরপুরিয়া খাব। চাঁদের আলোয় বসে খাব। সিন্দুকের পিঠে বসে খাব। খি খি খি। সরপুরিয়া খেতে ভাল। চাঁদের আলো দেখতে ভাল।

ঠিক আছে। ফিরে গিয়ে খাওয়াব। আগে সিন্দুক বের করি। তবে তো।

ততক্ষণে আমরা আরও এগিয়ে গেছি। সেই ভাঙা মন্দিরের স্তূপের পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় 'পাগল' হালদারমশাই নাচানাচি করছেন। তাঁর সামনে একজন তাগড়াই চেহারার লোক। পরনে প্যান্টশার্ট। একহাতে টর্চ আছে। জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে টর্চটা। অন্য হাতে সম্ভবত কোনও অস্ত্র। সেটা হালদারমশাইয়ের দিকে বারবার তাক করছে সে। হালদারমশাই নির্বিকার নৃত্য করছেন। দৃশ্যটা হাস্যকর বটে, কিন্তু ভয়ঙ্করও।

—এই শেষবার বলছি। দশ গোনার মধ্যে চিনিয়ে না দিলে জবাই করে ফেলব। রেডি! ওয়ান…টু…থ্রি…ফোর…ফাইভ…

হালদারমশাই মাটিতে পা ঠুকে বললেন—হেইখানে…হেইখানে… হেইখানে। দেবীদা কইছিল হেইখানে।

লোকটা হাসল।—যাচ্চলে! তুই কোন জেলার লোক রে? বরিশালে জন্ম নাকি?

—হঃ! দেবীদা কইছিল হেইখানে। Break the Jaw. Catch the Top! বরকধঝ কচতটপ।

—ঠিক আছে। এখানে যদি পোঁতা না থাকে, বুঝতে পারছিস কী হবে?

—হঃ কর্তা! বুঝছি।

—চল্। ফেরা যাক।

—সরপুরিয়া খাওয়াইবেন কর্তা!

—খাওয়াব চল্।

হঠাৎ স্তূপের কাছ থেকে একটা ছায়ামূর্তি গুঁড়ি মেরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। তার হাতের টর্চ ছিটকে পড়ল।

হালদারমশাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর গর্জে উঠলেন—তবে রে হালার পো! ঘুঘু দেহিছ, ফান্দ ত্যাহো নাই।

হালদারমশাই দুহাতে দ্বিতীয় লোকটাকে জাপটে ধরলেন। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। আমি উসখুস করছিলাম। কর্নেল চিমটি কেটে চুপ করে থাকতে ইশারা করলেন। প্রথম লোকটা টর্চ কুড়িয়ে নিতে ঝুঁকেছে, কাছাকাছি একটা গাছের আড়াল থেকে আরেকটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। প্রথম লোকটা টের পেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—কে?

—ইউ ট্রেচারাস! আমাকে বসিয়ে রেখে তুমি স্পটে চলে এসেছ? তবে মরো!

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল টর্চ জেলে চিৎকার করে বললেন—তার আগে তোমার খুলি উড়ে যাবে। ফায়ারআর্মসটা ফেলে দাও বলছি!

তারপর এদিক-ওদিক থেকে অনেকগুলো টর্চ জ্বলে উঠল। আশপাশের গাছ থেকে ধুপধাপ শব্দে কারা নামল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বললেন—হালদারমশাই! কাশেমকে পুলিশের জিম্মায় দিয়ে উঠে পড়ুন।

—হঃ। বলে উঠে দাঁড়ালেন হালদারমশাই।

দেখলাম, পুলিশের অফিসার ইনচার্জ রমেন পালিত এগিয়ে গিয়ে একটা ফায়ারআর্মস কুড়িয়ে নিলেন। বললেন—সুকমল সেন! আপনাকে দুটো মার্ডার এবং একটা অ্যাটেম্পট্ ফর মার্ডারের চার্জে অ্যারেস্ট করা হলো। তাছাড়া আপনার নামে এই রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে কাঠপাচারের সঙ্গে ইনভলভড্ থাকার জন্যও অনেক অভিযোগ আছে। আর শচীনবাবু! দেবীপ্রসাদ দাশগুপ্তের উপর অত্যাচার এবং ষড়যন্ত্রমূলক কাজের জন্য আপনার নামেও অভিযোগ আছে। দুঃখিত—আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।

শচীনবাবু বললেন—ভুল করবেন না মিঃ পালিত। আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

—আছে। দেবীবাবুর মেয়ে নীতাদেবী আজ থানায় গিয়ে আপনার

নামে অভিযোগ করে এসেছেন। দেবীবাবুর ওপর আপনি যথেষ্ট অত্যাচার করেছেন। কলকাতা-পুলিশও আমাদের মেসেজ পাঠিয়েছে।

শচীনবাবু হুমকি দিলেন।—প্রতাপকে জানালে আপনার বিপদ হবে মিঃ পালিত।

কর্নেল বললেন—হয়তো প্রতাপবাবু খুশিই হবেন এতে। তিনি স্থানীয় এম এল এ এবং মন্ত্রী। আপনাদের কাজকর্মে তাঁর পলিটিক্যাল ইমেজ নষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। চিন্তা করে দেখুন শচীনবাবু! এক-সময় আপনিই কাঠপাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। তার পর সুকমল সেনের সঙ্গে আপনার রফা হয়েছিল। কিসের রফা তাও বলছি। ১৯৪২ সালের আগস্টআন্দোলনে লুঠ-করা রেঙ্গুন ট্রেজারির সিন্দুকের খোঁজ দিতে চেয়েছিলেন এই সুকমল সেন। দেবীবাবুর জামাই হয়েছেন সেনসায়েব। অতএব আপনার পক্ষে ওঁর ফাঁদে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেনসায়েবও জানেন না কোথায় সেটা পোঁতা আছে। তবে কাঠপাচারের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের জড়িত থাকার আসল কারণ এই জঙ্গলে পুঁতে রাখা সিন্দুক অনুসন্ধান। ইতিমধ্যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইকে পাগল সাজিয়ে এখানে পাঠিয়ে আমি অমরেশ রায় এবং পরিতোষ লাহিড়ির হত্যা-রহস্যের সূত্র খুঁজতে চেয়েছিলাম। দৈবাৎ নীতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। তখন জানলাম, আসল খুনী কে। পাগল শ্বশুরকে টোপ করেছিলেন জামাই। কিন্তু নিছক সন্দেহের বশে অত্যন্ত অকারণ দু-দুটো নরহত্যা করে ফেললেন এই জামাই ভদ্রলোক। মিঃ সেন! অমরেশবাবু বা পরিতোষবাবু কেন, কেউই জানতেন না কোথায় সিন্দুক পোঁতা আছে।

সেনসায়েব বাঁকা হাসলেন।—আপনি জানেন তাহলে।

—হ্যাঁ। জেনেছি। আজ সকালেই আবিষ্কার করেছি। মিঃ পালিত! আসামীদের থানায় নিয়ে যান।...

বাংলোয় ফিরে হালদারমশাই দুঃখিতভাবে বললেন—অহন্ ড্রেস চেঞ্জ করব ক্যামনে? পূর্ণিমা হোটেলে আমার ড্রেস আছে। আনবে কেডা?

কর্নেল হাসলেন।—আপাতত জয়ন্তের পাঞ্জাবি-পাজামা পেয়ে যাবেন। স্নান করে নিতেও পারেন। বাথরুমে যান। ধুলোময়লায় নোংরা হয়ে আছেন।

হালদারমশাই বললেন—হঃ। ঠিক কইছেন। গা ঘিনঘিন করতাছে।

উনি বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। বললাম—সব বোঝা গেল। কিন্তু বিলুকে খুন করতে গিয়েছিল কে?

কর্নেল বললেন—আমার কথাটা ভুলে গেছ ডার্লিং। বলেছিলাম সেই খুনীর আসল টার্গেট নীতাও হতে পারে। হ্যাঁ—নীতাই বটে। তবে নীতাকে মেরে সে নিশ্চয় বিলুকেও রেহাই দিত না। বিলু গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেত বলে মনে হয় না। দুজনকেই মরতে হতো।

—কিন্তু লোকটা কে?

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে দিলেন। বললেন—লোকটাকে কিছুক্ষণ আগে টর্চের আলোয় দেখেছ। এবার দেখ তো, চিনতে পারো কি না?

ছবিটা দেখেই বললাম—ফরেস্টগার্ড কাশেম না?

—হ্যাঁ। সেনসায়েবের চেনা কাশেম। সেনসায়েব এবার নীতাকে নিয়ে এসে খতম করতে চেয়েছিলেন। কারণ নীতা তাঁর অনেক অপরাধের সাক্ষী। বিশেষ করে অমরেশ এবং পরিতোষকে হুমকি দেওয়া চিঠিগুলো নীতার হাতের লেখা। নীতাকে চিঠি লিখতে বাধ্য করতেন সুকমল সেন। অমরেশবাবুর স্ত্রীকে লেখা চিঠির হস্তাক্ষর এবং আমাকে আজ লিখে-যাওয়া চিঠির হস্তাক্ষর হুবহু এক।

চমকে উঠে বললাম—তা-ই বটে। চিঠির হস্তাক্ষর দেখে চেনা লাগছিল।

কর্নেল কিটব্যাগের চেন খুলে বললেন—তুমি তো জানো, আমার বাড়িতে জেরক্স মেশিন আছে। নন্দিনীর দিয়ে-যাওয়া ইনল্যাণ্ড লেটারের জেরক্স কপির সঙ্গে বাথরুমে রেখে-যাওয়া নীতার চিঠির হস্তাক্ষর মিলিয়ে দেখ।

কর্নেল চিঠি দুটো বের করে দিলেন। মিলিয়ে দেখে বললাম—হ্যাঁ। একই হস্তাক্ষর।

হালদারমশাই বাথরুম থেকে উঁকি দিয়ে বললেন—জয়ন্তবাবু! পাজামা-পাঞ্জাবি!

কিছুক্ষণ পরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ সেজেগুজে বেরুলেন। কর্নেল বললেন—ভোলাকে ডেকে আনো জয়ন্ত! হালদারমশাইয়ের শোবার ব্যবস্থা করা দরকার। ডিনারের ব্যবস্থা করা যাবে না। তবে ভোলার ভাঁড়ারে পাঁউরুটি সন্দেশ মিলতেও পারে।

হালদারমশাই জোরে হাত নেড়ে বললেন—নাহ্। যাই গিয়া।

—সে কী! এত রাত্রে কোথায় যাবেন?

—পূর্ণিমা হোটেলে। ওনারের লগে মামা-ভাগ না সম্বন্ধ করছি। ভাগ্না চিন্তায় আছে।

—কিন্তু এখন কি ওখানে মিলের ব্যবস্থা হবে?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন—শচীনবাবু জামাইআদরে ডিনার সার্ভ করছেন। খিচুড়ি, ডিমসেদ্ধ, পাঁপড়ভাজা, চাটনি। যাই গিয়া! মর্নিংয়ে আসব।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে বেরিয়ে গেলেন!...

ভোরে কর্নেলের তাড়ায় ঘুম থেকে উঠতে হলো। ভোলা আমার জন্য বেড-টি এবং কর্নেলের জন্য কফি দিয়ে গেল। তারপর কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরুলেন। গ্রীষ্মের প্রত্যূষে বনভূমির অপার্থিব সৌন্দর্য আছে। এই প্রথম সেই সৌন্দর্য দেখলাম। সদ্য ঘুম ভেঙে পাখিরা ডাকাডাকি করছে। গাছপালার মধ্যে যেন জেগে ওঠার স্পন্দন। হাল্কা বাতাসে অজানা ফুলের সৌরভ। সেই স্তূপের মাথায় উঠে কর্নেল বললেন—দেখে যাও।

ঝোপঝাড় ঠেলে ওঁর কাছে গিয়ে দেখি, কর্নেল নুয়ে-পড়া ঝোপ-লতাপাতা সরাচ্ছেন। একহাত চওড়া একটা ফাটলের ভেতর অন্ধকার ছমছম করছে। কর্নেল টর্চ জ্বাললেন। গভীর ফাটলের তলায় কী একটা কালো জিনিসের কোণের অংশ দেখা যাচ্ছে। বাকিটা মাটির

ভেতর ঢাকা পড়েছে। বললাম—ওটাই কি সেই সিন্দুক?

কর্নেল বললেন—সিন্দুকের একটা কোণ দেখা যাচ্ছে। ওটা আইনত সরকারি সম্পত্তি। ওটার হদিস পুলিশকে এবার দেওয়া দরকার। এক মিনিট!

বলে কর্নেল স্তূপের মাথা থেকে কয়েকটা চাঙড় ফাটলে গড়িয়ে ফেললেন। ঢাকা পড়ল গুপ্তধন। তারপর ঝোপ-লতাপাতাগুলো আগের মতোই টেনে ফাটলটা ঢেকে দিলেন।

বাংলোয় ফিরে এসে কর্নেল বললেন—নীতার সেই রুমালটা সঙ্গে নাও ডার্লিং!

—ভ্যাট! কী যে বলেন?

—বা রে! রুমালটা ওকে ফেরত দিতে হবে না? এই বৃদ্ধের হাতে কোনও যুবতীর রুমাল শোভা পায় না! চলো! ফেরার পথে হালদারমশাইকে পূর্ণিমা হোটেল থেকে নিয়ে আসব। সাড়ে দশটার ট্রেনে কলকাতা ফিরব একসঙ্গে।

নাক-বরাবর জঙ্গলের ভেতর হেঁটে স্টেশন রোডে পৌঁছুলাম। বললাম—সেনসায়েব নীতাকে খুনের জন্য কাশেমকে পাঠিয়েছিলেন! পুলিশকে এটা বলবেন না? এটা ওঁর সেকেণ্ড মার্ডার-অ্যাটেম্প্‌ট্‌।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। ছবিটা তো নিয়ে যাচ্ছি সেজন্যই।

একটা খালি রিকশা দাঁড় করিয়ে আমরা উঠে বসলাম। কর্নেলের চোখে বাইনোকুলার। একখানে হঠাৎ বললেন—রোখো! রোখো!

সাইকেল-রিকশা থেমে গেল। কর্নেল চোখ টিপে হেসে বললেন—সকালের আলোয় যুবক-যুবতীদের নিভৃত প্রেমালাপ এই কদর্য পৃথিবীকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপহার দেয়, ডার্লিং। ওই দেখ। উঁহু, ওদিকে নয়। পার্কের দিকে তাকাও!

পাশেই একটা পার্ক। কোণার দিকে বেঞ্চে ফুলের ঝোপের আড়ালে দুটিতে বসে আছে। পাশে দাঁড় করানো মোটর সাইকেল। বললাম—কী আশ্চর্য!

—নাহ্‌। এটাই স্বাভাবিক! যৌবন যৌবনকে এমনি করে

টানে। তবে দার্শনিকরা বলেছেন, প্রেম এসে মানুষের ভেতরকার হিংস্র পশুকে তাড়িয়ে দেয়—প্রেম এত শক্তিমান!

—কিন্তু নীতা তো পরস্ত্রী!

—হুঁ। আপাতত পরকীয়া প্রেম বলা চলে। তবে সরকার ডিভোর্স আইন চালু করেছেন। কাজেই ডার্লিং! তোমার চিন্তার কারণ নেই। যাও, রুমাল ফেরত দিয়ে এসো।

—কী বলছেন! ওই মস্তানটার কাছে আমি যাব?

—হ্যাঁ। বিলু মস্তান-টস্তান বটে। তবে আশা করি, নীতা ওকে জব্দ করতে পারবে। মেয়েরা এটা পারে, জয়ন্ত! যাও! রুমালটা দিয়ে এসো।

—নাহ। আপনি যান।

কর্নেল রিকশাওলাকে বললেন—এক মিনিট। আসছি।

বলে বৃদ্ধ রহস্যভেদী আমার হাত থেকে রুমাল নিয়ে পার্কে ঢুকে পড়লেন। রিকশাওলা অবাক হয়ে বলল—কী হলো স্যার? বুড়োসায়েব কোথায় যাচ্ছেন? আমার যে লেট হয়ে যাচ্ছে।

বললাম—ভেবো না। বুড়োসায়েব পুষিয়ে দেবেন। তবে উনি কার কাছে যাচ্ছেন জানো তো? শচীনবাবুর ছেলে বিলুবাবুর কাছে। চেনো না বিলুবাবুকে?

রিকশাওলা অমনি ভড়কে গিয়ে শুধু উচ্চারণ করল—অ!

—অ নয়। বরকধঝ-কচতটপ।

—আজ্ঞে?

—হাসতে হাসতে বললাম—কিছু না।…

বিজ্ঞাপনের আড়ালে

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁর ড্রয়িংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দাঁতে কামড়ানো জ্বলন্ত চুরুট থেকে সুতোর মতো নীল ধোঁয়া তাঁর টাকের কয়েক ইঞ্চি ওপরে গিয়ে সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কাগজ নামিয়ে আমার দিকে ঘুরে বললেন, "আচ্ছা! জয়ন্ত, আজকাল রঙিন বাংলা ফিচার ফিল্ম তুলতে কত টাকা লাগে?"

বললুম, "কেন? ফিল্ম মেকার হতে চান নাকি?"

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গম্ভীর মুখে সাদা দাড়ি নেড়ে বললেন, "নাহ্! এমনি জানতে ইচ্ছে করছে। ফিল্ম লাইনে তোমার তো জানাশোনা আছে। তাই—"

"সঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা, পনের লাখ টাকার কমে আজকাল রঙিন ছবি হয় না। হিন্দি করলে সম্ভবত মিনিমাম এর দ্বিগুণ।"

কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, হুঁ লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। কাজেই মাসের পর মাস অভিনেতা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু মাত্র একজন অভিনেতার জন্য—ঠিক এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। একজন বয়স্ক অভিনেতা। নায়িকার বাবার চরিত্রে তাঁকে নামানো হবে। বয়স্ক অভিনেতার কি আকাল পড়ে গেছে দেশে?"

স্বগতোক্তির মতো কথাগুলো চোখ বুজে আওড়ালেন কর্নেল। তারপর টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু অবাক হয়ে বললুম, "এতে আপনার চিন্তাভাবনার কী আছে, বুঝতে পারছি না।"

"আছে। গত ছ'মাস ধরে প্রতি রবিবার চোখে পড়ার মতো জায়গায় প্রত্যেকটি কাগজে বিজ্ঞাপন ইংরেজি এবং বাংলায়।"

কর্নেলকে এই সাধারণ ব্যাপারে চিন্তাকুল হতে দেখে একটু হেসে

বললুম, "আশাকরি কোনও রহস্যের আঁচ পেয়েছেন। বিজ্ঞাপনটা দেখি!"

কর্নেলের সামনে টেবিলের ওপর কয়েকটা বাংলা আর ইংরেজী কাগজ ভাঁজ করা আছে। তাঁর কোলের বাংলা কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা। যতদূর জানি, এই কাগজটা সারা দেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার কাগজের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এতেও দু'মাস ধরে বিজ্ঞাপন! তুমি এই কাগজের স্পেশাল রিপোর্টার। কাজেই ভালোই জানো, তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের দর সবচেয়ে বেশি।"...

কর্নেল আবার তেমনি চোখ বুজে আপন মনে এইসব কথা বলছিলেন। ততক্ষণে বিজ্ঞাপনটা দেখা হয়ে গেছে আমার। কর্নেল লাল ডটপেনে ডাবল্‌-কলম বিজ্ঞাপনটার চারদিকে রেখা টেনে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা পড়ে আমার একটুও খটকা লাগল না। এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই কাগজে থাকে।

বয়স্ক অভিনেতা চাই

জয় মা কালী পিকচার্সের নির্মীয়মান বাংলা কাহিনীচিত্রে নায়িকার পিতার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য একজন বয়স্ক অভিনেতা চাই। ফটোসহ পূর্ব অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে লিখুন।
বক্স নং ৮৮৭৩

সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বললুম, "রহস্যের পেছনে সারা-জীবন ছোটাছুটি করে আপনাকে রহস্যের ভূতে পেয়েছে। এখন সবকিছুতেই রহস্য দেখছেন।"

কর্নেল সোজা হয়ে বসে হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিজ্ঞাপনটা স্বাভাবিক মনে হবে—মানে, বিজ্ঞাপনের ম্যাটারটার কথা বলছি। কিন্তু কেন একই বিজ্ঞাপন গত দুমাস ধরে প্রায় আটবার? আবার সেই কথাটাই বলছি, জয়ন্ত! দেশে কি প্রবীণ অভিনেতার অভাব আছে?"

"প্রবীণ নয়, বয়স্ক।"

"একই কথা। তা ছাড়া বয়স্ক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যখন এতদিন উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না এখনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে বলেই কথাটা উঠছে, তখন একজন যুবক অভিনেতাই যথেষ্ট। মেক-আপ করে তাকে বয়স্ক মানুষ সাজানো কত সহজ।"

"হয়তো পরিচালক অত্যন্ত আধুনিকমনা। মেকআপের চেয়ে স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা অ্যাশট্রেতে রেখে বললেন, ঠিক বলেছ ডার্লিং! স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী। এটাই একটা মূল্যবান পয়েন্ট। কিন্তু কেন এই দুমাস তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না?"

"কী মুশকিল!" একটু বিরক্ত হয়ে বললুম। "লোক পছন্দ হচ্ছে না। কিংবা চেহারায় পছন্দ হলেও অভিনয়ে কাঁচা। অজস্র কারণ থাকতে পারে।"

ষষ্ঠীচরণ এসে কফির ট্রে রেখে ব্যস্তভাবে বলল, "জোর বৃষ্টি আসছে, বাবামশাই! আপনি বলছিলেন নতুন টবগুলো পলিথিনে ঢেকে দিতে। দেব?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "হুঁ, দ্যাটস দা পয়েন্ট, ডার্লিং! অজস্র কারণ থাকতে পারে। কিন্তু" বলে জানালার দিকে ঘুরলেন। "ষষ্ঠী! বৃষ্টি! শীগগির ছাদে যা!"

ষষ্ঠী বেজার মুখে বলল, "সেটাই তো আমি বলছিলুম। আপনি কানই করছেন না।"

কর্নেল চোখ কটমট করে তাকালেন। সে চলে গেল। বললুম, "জোর বৃষ্টি মনে হচ্ছে। আপনাদের এই রাস্তাটায় একপশলা বৃষ্টিতেই এককোমর জল জমে যায়। কফিটা শেষ করে কেটে পড়ি।"

কর্নেল আমার কথায় কান করলেন না। কফির পেয়ালা হাতে উঠে জানালায় গিয়ে বৃষ্টি দেখে আমার দিকে ঘুরলেন। বললেন, "অজস্র কারণ, নাকি একটা কারণ? সেই বিশেষ কারণের জন্য এখনও নায়িকার বাবার চরিত্রে লোক পাওয়া যাচ্ছে না।"

ওঁর কথার ওপর বললুম, "আপনি নিজের ফটোসহ চিঠি লিখুন বরং। আমি চলি।"

এই সময় ডোর বেল বাজল। কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন, ছাদে। জয়ন্ত, কিছু যদি মনে না করো, দেখ তো কে এলেন?"

একটু হেসে চাপা স্বরে বললুম, "নিশ্চয় জয় মা কালী পিকচার্সের পরিচালক।"

কর্নেল গম্ভীর হয়েই বললেন, "কিছু বলা যায় না। ওই শোনো, লিণ্ডাদের কুকুর চ্যাঁচামেচি করছে। তার মানে কেউ এই প্রথম আমার অ্যাপার্টমেণ্টে আসছেন।"

উঠে গিয়ে সংলগ্ন ছোট ওয়েটিংরুমের দরজা খুলে দিলুম। ঝোড়ো কাকের মতো এক ভদ্রলোক জড়োসড়ো দাঁড়িয়েছিলেন। বৃষ্টিতে পোশাক একটু ভিজেছে। হাতে ভিজে ছাতি। লম্বাটে গড়নের অমায়িক চেহারা। প্যাণ্টের পকেট থেকে স্টেথিস্কোপ উঁকি মেরে আছে! অতএব হাতের গাব্দাগোব্দা ব্যাগটা নিঃসন্দেহে ডাক্তারি ব্যাগ এবং ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। নমস্কার করে আড়ষ্টভাবে বললেন. "আমি কর্নেলসায়েবের সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরি ব্যাপারে দেখা করতে চাই।"

ওঁকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলুম। উনি কর্নেলকে নমস্কার করে একটা নেমকার্ড দিলেন। তারপর সোফায় ধপাস করে বসলেন। বললেন, "কাগজে আপনার অনেক কীর্তিকলাপ পড়েছি। আমার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসার। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। বরং কর্নেলসায়েবের কাছে যান। তাঁর কাছে আপনার ঠিকানা পেয়ে সোজা চলে এলুম।"

কর্নেল কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, "বলুন।"

"ভবানীপুর এরিয়ায় আমার চেম্বার। খুলে বলাই উচিত, ডিগ্রি থাকলেও ডাক্তারিতে আমি বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। চেম্বারে বসে মাছি তাড়াই।" করুণ হেসে ডাক্তার বললেন, "যাই হোক,

মাসখানেক আগে লেকভিউ রোডের এক অসুস্থ ভদ্রলোককে চিকিৎসার জন্য কল পেয়েছিলুম। বনেদী বড়লোক। রোগীর বয়স প্রায় ৬৫ বছর। অনেক পরীক্ষা করেও কোনও শারীরিক গণ্ডগোল টের পাইনি। মানসিক অসুখ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নেহাত টাকার জন্য এমন শাঁসালো রোগীকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে ছিল না! ভাবুন, প্রতিবার কল অ্যাটেণ্ড করি আর পাঁচশো করে টাকা পাই। এক সপ্তাহে পাঁচটা কল! তার মানে আড়াই হাজার টাকা! এদিকে রোগীর সেই একই অবস্থা। প্রেসক্রিপশানে টনিক আর ঘুমের ওষুধ লিখে দিই। এভাবেই চলছিল। শেষবার কল অ্যাটেণ্ড করতে গিয়ে দেখি, রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দেখেই বুঝলুম, অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। তখন আমার খুব অনুতাপ জাগল। ডাক্তার হিসেবে যে এথিক্স মেনে চলা উচিত ছিল, আমি টাকার লোভে তা মানিনি। আসলে ওই যে বললুম, নিছক মানসিক অসুখ বলেই মনে হয়েছিল। বড় লোকদের বুড়োবয়সে অনেক বাতিক উপসর্গের মতো দেখা যায়। সেটাই ভেবেছিলুম।"

ডাক্তার শ্বাস ফেলে চুপ করলেন। কর্নেল বললেন, "রোগী মারা গেল?"

"হ্যাঁ! আমারই ভুলে—"

"আপনি ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন নিশ্চয়?"

"দিলুম। না দিয়ে তো উপায় ছিল না। আমার সামনেই মৃত্যু হলো। তা ছাড়া অতদিন ধরে দেখছি।"

"মৃত্যুর কী কারণ দেখালেন?"

"করোনারিথ্রম্বসিস।"

কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।" তারপর বললেন, "রোগী মারা গেল কোন তারিখে?"

"আজ সতের জুলাই। রোগী মারা গেছে ২৭ জুন।"

"হুঁ, তা এ ব্যাপারে আমার কাছে আসার কারণ কী?"

ডাক্তার নড়ে বসলেন। মুখে উত্তেজনার ছাপ। চাপা স্বরে বললেন, "কিছুদিন আগে সন্ধ্যায় চেম্বারে একা বসে আছি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন। দেখেই ভীষণ চমকে উঠলুম। সেই রোগী। একই চেহারা। আমার ভুল হতেই পারে না। মুখে কেমন ভুতুড়ে হাসি। আমি ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। উনি বললেন, কী ডাক্তারবাবু খেলাটা ধরতে পারেন নি? আসুন, আমরা একটা রফা করি। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বেরিয়ে যান বলছি। বেরিয়ে যান!' ভদ্রলোক সেইরকম ভুতুড়ে হেসে বেরিয়ে গেলেন।"

ডাক্তার পকেট থেকে ইনল্যাণ্ড লেটার বের করে বললেন, "এই চিঠিটা গত পরশু ডাকে এসেছে। পড়ে দেখুন।"

কর্নেল চিঠি পড়ে আমার হাতে দিলেন। চিঠিটা এই:

"ডাক্তারবাবু,

আমি জানি, আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যদি বাড়ি গাড়ি করার মতো টাকাকড়ি পান, ছাড়বেন কেন? সেদিন আপনার সঙ্গে রফা করতে গিয়েছিলুম। আপনি ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করলেন। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আপনি আগামী রবিবার ১৭ই জুলাই সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দেশপ্রিয় পার্কে অবশ্য করে আসুন। আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। আমি আপনার হিতৈষী।"

চিঠির তলায় কোনও নাম নেই। চিঠিটা পড়ে কর্নেলকে ফেরত দিলুম। কর্নেল বললেন, "আমিও আপনাকে বলছি, আপনি আজ সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। উনি কী বলছেন শুনুন।"

ডাক্তার করুণ মুখে বললেন, "যদি কোনও বিপদে পড়ি?"

"আমরা দুজনে আপনার কাছাকাছি থাকব। আপনার চিন্তার কারণ নেই।"

ষষ্ঠী কফি আনল। বাইরে বৃষ্টিটা কমেছে। কফির পেয়ালা

ডাক্তারের হাতে এগিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন, "এবার আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।"

ডাক্তার কফিতে চুমুক দিয়ে তেমনি করুণ মুখে বললেন, "একটা কেন, যত খুশি প্রশ্ন করুন। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে।"

টেবিলে ওঁর নেমকার্ডটা রাখা ছিল। এতক্ষণ হাতে নিয়ে দেখলুম, ওঁর নাম ডাঃ বি বি পাত্র। ডিগ্রির লেজুড়টি বেশ লম্বা অথচ পসার করতে পারেন নি, এর কারণ বোধহয় ওঁর হাব-ভাব-ব্যক্তিত্ব। ডাক্তারি পেশায় স্মার্ট না হলে চলে না। ডাঃ পাত্রের এই জিনিসটার অভাব আছে। সর্বদা কেমন আড়ষ্ট এবং করুণ হাবভাব। ডাক্তারকে দেখে যদি রোগীরই মায়া হয়, তাহলে সমস্যা।

কর্নেল বললেন, "লেকভিউ রোডে সেই বাড়ির নম্বর কত?"

ডাঃ পাত্র বললেন, "১৭/২ নম্বর। গেট আছে। বনেদী পুরনো বাড়ি। চারদিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা। দেখলে পোড়ো বাড়ি মনে হয়। জঙ্গল গজিয়ে আছে লনে।"

"রোগীর নাম কী ছিল?"

"দেবপ্রসাদ রায়।"

"বাড়িতে লোকজন কেমন দেখেছেন?"

"কয়েকজন লোক দেখেছি। দেবপ্রসাদবাবুর মেয়ে চৈতী পরমাসুন্দরী। আর একজন ভদ্রলোক চৈতীর মামা। পুরো নাম জানিনা। ওঁকে গোপালবাবু বলে ডাকতে শুনেছি। গোপালবাবুই গাড়ি করে আমাকে চেম্বার থেকে নিয়ে যেতেন।"

"রোগীকে দেখার সময় কোনও বিশেষ ব্যাপার আপনার চোখে পড়ত?"

ডাঃ পাত্র একটু ভেবে বললেন, "ঘরে শুধু চৈতী আর গোপালবাবু থাকতেন। চৈতী তার বাবার পায়ের কাছে। গোপালবাবু মাথার কাছে।...হ্যাঁ, একটা ব্যাপার—"

"বলুন!"

"ঘরে প্রচণ্ড আলো। আমার চোখ ধাঁধিয়ে যেত। কিন্তু রোগী

নাকি উজ্জ্বল আলো ছাড়া থাকতে পারেন না।"

"আর কিছু ?"

"হ্যাঁ, আলোর আড়ালে কারা সব ফিসফিস করে কথা বলত। ভাবতুম, আত্মীয়স্বজন।"

"দেবপ্রসাদবাবুর মৃত্যুর দিন বিশেষ কিছু চোখে পড়েছিল ?"

"নাহ্।"

"আলো ?"

ডাঃ পাত্র নড়ে বসলেন। বললেন, "সে রাতে আলো অত বেশি ছিল না। শুধু একপাশে মাথার দিকে একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলছিল। সম্ভবত অন্তিম অবস্থা দেখেই আলো কমানো ছিল।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "কেসটা করোনারি থ্রম্বসিস বলে মনে হয়েছিল আপনার ?"

ডাঃ পাত্র একটু ইতস্তত করে বললেন, "নাকে মুখে রক্ত, একটু ফেনা এসব দেখেই...তবে গোপালবাবু বলেছিলেন, থ্রম্বসিস লিখে দিন। আমি তাই লিখেছিলুম ডেথ সার্টিফিকেট।"

"আর একটা প্রশ্ন। সবগুলো কলই কি রাতে অ্যাটেণ্ড করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে।"

"প্রতিবার গোপালবাবু এসে গাড়ি করে আপনাকে নিয়ে যেতেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "ঠিক আছে। আপনি আজ সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে দেশপ্রিয় পার্কে উপস্থিত থাকবেন। ভয়ের কারণ নেই। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। তাছাড়া আমরা আড়ালে থেকে লক্ষ্য রাখব।" ..

ডাঃ বি বি পাত্র চলে যাওয়ার পর কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "কী বুঝলে বলো জয়ন্ত ?"

বললুম, "মাথামুণ্ডু কিস্যু বুঝিনি।"

"বরং চলো লেকভিউ রোডে ঘুরে আসি। বৃষ্টি ছেড়ে বেশ রোদ্দুর উঠেছে।"

আমি গাড়ি আনিনি। কর্নেলের লাল টুকটুকে ল্যাণ্ডরোভারে চেপে লেকভিউ রোডে গিয়ে পৌঁছলুম। ১৭।২ নম্বরের বাড়িটা ডঃ পাত্রের বর্ণনা অনুযায়ী বনেদী এবং পুরনো। গেটে কোনও দারোয়ান নেই। লনে একসময় সুদৃশ্য ফুলবাগান ছিল বোঝা যায়। এখন জঙ্গল হয়ে আছে। কর্নেল ও আমি গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখছিলুম। পোর্টিকোর দিক থেকে একজন সাদাসিধে চেহারার লোক এসে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই স্যার?"

কর্নেল অমায়িক হেসে বললেন, "গোপালবাবু আছেন?"

"উনি তো সকালে বেরিয়ে গেছেন।"

"তোমার নাম কী ভাই?"

লোকটা কর্নেলকে দেখে নিশ্চয় অভিভূত। একটু হেসে বলল, "আজ্ঞে স্যার, আমি গোবিন্দ। এ বাড়িতে থাকি।"

"তোমাদের বুড়োকর্তা দেবপ্রসাদবাবু—"

কথা শেষ করার আগেই গোবিন্দ বলল, "উনি তো মারা গেছেন স্যার। ও মাসে আমাকে নিয়ে নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই রাত্তিরে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন।"

"দেবপ্রসাদবাবুর মেয়ের নাম চৈতী। তাই না? ওকে একবার ডেকে দাও না! একটু কথা আছে।"

গোবিন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'বুড়োকর্তার তো কোনও মেয়ে নেই স্যার! উনি একা মানুষ।"

"তাহলে চৈতী নামে সুন্দরী মেয়েটি কে? এ বাড়িতেই গতমাসে ওকে দেখেছি গোপালবাবুর সঙ্গে।"

গোবিন্দ হাসল। "বুঝেছি। গোপালবাবু সিনেমা করেন। ওঁর ছবিতে পার্ট করে যে মেয়েটি, আপনি তার কথাই বলছেন।"

এবার আমার ফ্যালফ্যাল করে তাকানোর পালা। কর্নেল বললেন "গোপালবাবু দেবপ্রসাদবাবুর কে হন?"

"দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই।"

"বুড়োকর্তার সব সম্পত্তি উনিই পেয়েছেন তাই না?"

"আজ্ঞে। গোপালবাবুর নামে উইল করা ছিল।"

"তুমি কিছু পাওনি?"

"আজ্ঞে স্যার, পাইনি বললে মিথ্যা বলা হবে। নগদ ভালই পেয়েছি।"

"দেবপ্রসাদবাবু কবে মারা যান?"

"নৈনিতাল থেকে দুপুরে ফিরলুম ওঁর সঙ্গে। শরীরটা এমনিতেই ভাল ছিল না। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ট্রেন জার্নির ধকল। তো হঠাৎ শুনি গোপালবাবু ডাকাডাকি করছেন আমাকে। আমি নিচের তলায় থাকি। ওপরে গিয়ে দেখি কর্তামশাই ধড়ফড় করছেন। গোপালবাবু তখনই ডাক্তার ডাকতে গেলেন। গোপাল-বাবুর ছবির মেয়েটি আর আমি কর্তামশাইয়ের সেবাযত্ন করলুম। কিন্তু বাঁচানো গেল না। ডাক্তার আসার একটু পরেই মারা গেলেন।

"তোমার কর্তামশাই কোনও কথা বলেন নি তোমাকে? কী হয়েছে বা হঠাৎ কেন—"

গোবিন্দ বলল, "মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। গোঁ গোঁ করছিলেন। মুখে ফেনা বেরুচ্ছিল।"

কর্নেল বললেন, "আচ্ছা, চলি গোবিন্দ। পরে আসব'খন। গোপালবাবুর সঙ্গে দরকার ছিল।"

"টালিগঞ্জে মায়াপুরী স্টুডিওতে ওঁকে এখন পেতে পারেন।"

কর্নেল ডাকলেন, "এস জয়ন্ত।"

গাড়ি লেকভিউ রোড ধরে এগোচ্ছিল টালিগঞ্জের দিকে। আমি চুপচাপ বসে আছি। কর্নেল বললেন, "এবার আশা করি কিছু বুঝতে পেরেছ জয়ন্ত।"

বললুম, "পারছি, আবার পারছি না। সেই বিজ্ঞাপনটা—"

"হ্যাঁ ডার্লিং, সেই বিজ্ঞাপনটাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত!"

"কিন্তু ঘটনাটা কী?"

নৈনিতালে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে এসে হঠাৎ দেবপ্রসাদবাবুর মৃত্যু এবং তাঁর মামাতো ভাই ফিল্মমেকার গোপালবাবুর সম্পত্তি লাভ। ফিল্ম করার জন্য যত টাকার দরকার, এবার পেয়ে গেছেন।"

"আর বলবেন না প্লিজ! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।"

টালিগঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে কর্নেল বললেন, "নাঃ। থাক। অকারণ জল এখনই ঘোলা করে লাভ নেই। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যা ছটা নাগাদ তুমি আসতে ভুলো না।"

কথামতো কর্নেল ও আমি সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছেছিলুম। গাড়ি বাইরে রেখে পার্কের ভেতরে ঢুকে একটা বেঞ্চে তুজনে বসলুম। সময় কাটতে চায় না। পার্কে এখানে-ওখানে লোকজন আছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "ডাঃ পাত্র এসে গেছেন। ওই ত্যাখো।"

কিছুটা তফাতে একটা ঝোপের কাছে ডাঃ পাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। উনি এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলেন। একটু পরে একটা লোক এসে ওঁর সামনে দাঁড়াল। আবছা আলোয় দেখতে পাচ্ছিলুম, লোকটির পরনে প্যান্ট-শার্ট। মাথার চুল শাদা। অথচ কাঠামোটি মজবুত। বয়স্ক লোক বলেই মনে হলো।

'ডাঃ পাত্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ছায়ার আড়ালে চলে গেল। কর্নেল আমাকে ইশারা করলেন। তুজনে এগিয়ে গেলুম। কিছুটা এগিয়েছি, হঠাৎ পর-পর তিনবার গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপর একটা শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। পালানোর হিড়িক পড়ে গেছে। কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে ঝোপের পেছন থেকে যাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন, তিনি ডাঃ পাত্র।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "চলে আস্থন আমাদের সঙ্গে।'

তিনজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। ডাঃ পাত্র দমআটকানো গলায়

বললেন, 'ও! আর একটু হলেই কি সাংঘাতিক কাণ্ড! এজন্যই আমি আসতে চাইছিলুম না।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "গোপালবাবু অসম্ভব ধূর্ত লোক! সম্ভাব্য ব্ল্যাকমেলারকে শেষ করে দিলেন। আমার ধারণা ভদ্রলোক ওঁর ফিল্ম ইউনিটেরই লোক। যাই হোক, ডাঃ পাত্র! ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনাকে দিয়ে আমি ফাঁদ পাততে চাই।"

ডাঃ পাত্র ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "ওরে বাবা! আমি আর এসবের মধ্যে নেই।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ভয়ের কিছু নেই। আসলে ওই সম্ভাবনাটা আমি আঁচ করতে পারিনি। তবে ডাঃ পাত্র, আপনি এবং দেবপ্রসাদবাবুর পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দ গোপালবাবুর পক্ষে বিপজ্জনক। এখনই গোবিন্দকে ও বাড়ি থেকে সরানো দরকার। অবশ্য জানি না, এখন সে জীবিত, না মৃত।"

শিউরে উঠে বললুম, "বলেন কী!"

কর্নেল সারা পথ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে এলেন। ডাঃ পাত্রকে মনে হচ্ছিল ভিজে কাকতাড়ুয়া। তেতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্ট। ড্রয়িংরুমে ঢুকেই কর্নেল ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম দিলেন। তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করার পর কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ীর সঙ্গে কথা বলছেন।

ফোন করে কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন, "আপনার প্যাডে একটা চিঠি লিখবেন ডাঃ পাত্র! গোপালবাবুকে লিখবেন।"

ডাঃ পাত্র করুণমুখে বললেন, "প্যাড তো সঙ্গে নেই।"

"কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব'খন। তবে কী লিখবেন, শুনুন।" কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "লিখবেন : প্রিয় গোপালবাবু, আগামীকাল সোমবার রাত আটটায় আমার চেম্বারে অবশ্যই দেখা করবেন। জরুরি কথা আছে। আপনি দেখা না করলে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানাব। দেবপ্রসাদ-

বাবু যখন নৈনিতালে ছিলেন, তখন আপনি ওঁর বাড়িতে একজন লোককে দেবপ্রসাদবাবু সাজিয়ে আমাকে ডেকেছিলেন। সেই লোকটি ভাবত, সে অভিনয় করছে। আপনার বিজ্ঞাপনের গোপন কথা, আমি জানতে পেরেছি।...বিজ্ঞাপন কথাটা আণ্ডারলাইন করে দেবেন।"

ডাঃ পাত্র অবাক হয়ে বললেন, "কিসের বিজ্ঞাপন?"

"অবিকল দেবপ্রসাদবাবুর মতো দেখতে এমন একজন বয়স্ক অভিনেতা চাই। বিজ্ঞাপনটা গত দু'মাস ধরে বেরুচ্ছে।" কর্নেল একটু হাসলেন। "জয়ন্তদের কাগজের বিজ্ঞাপন দফতরে খোঁজ করলে নিশ্চয় দেখা যাবে, বিজ্ঞাপনদাতা কে? কাল সেটা জেনে নেব'খন। যাই হোক, ডাঃ পাত্র, আপনি চিঠিটা লিখে আমাকে দেবেন। আমি আজ রাতেই ওটা গোপালবাবুর বাড়ির লেটার বক্সে রেখে আসব।"

এতক্ষণে আমার বুদ্ধির দরজা খুলে গেল। বললুম, "কর্নেল! রহস্য ক্লিয়ার।"

"বলো শুনি।"

ষষ্ঠী কফি রেখে গেল। কফি খেতে খেতে বললুম, "ডাঃ পাত্র বলেছেন মোট পাঁচটা কল অ্যাটেণ্ড করেছিলেন। চারটে কলের সময় নকল দেবপ্রসাদবাবু রোগী সেজে ছিলেন এবং ২৭ জুন শেষ কলের সময় সত্যিকার দেবপ্রসাদবাবুকে দেখেছেন। নিশ্চয় তাঁকে বিষ-টিষ খাওয়ানো হয়েছিল। গোপালবাবুর দরকার ছিল একটা ডেথ সার্টিফিকেটের। পাছে কোনওভাবে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়, তাই ডাঃ পাত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। ডাঃ পাত্র বরাবর দেবপ্রসাদ বাবুর চিকিৎসা করেছেন। তাঁর কোনও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া কোনও ঝামেলা হলে তিনি সাক্ষী দেবেন। অসাধারণ প্ল্যান। শুধু বোঝা যাচ্ছে না, কাজ হয়ে যাওয়ার পরও কেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে লোকটা?"

কর্নেল বললেন, "ঘটনাটা চাপা দেওয়ার জন্য। এখনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তার মানে এখনও লোক পাওয়া যায়নি। খুব সহজ হিসেব। এতে গোপালচন্দ্র নিরাপদ থাকছে। কিন্তু যেভাবে হোক

নকল দেবপ্রসাদ রহস্যটা আঁচ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁকে খুন করা হলো। তাঁর কাছে আর কিছু জানার উপায় রইল না। অভিনেতা ভদ্রলোক প্রথমে ভেবেছিলেন, শুটিং করা হচ্ছে। পরে সব টের পান।”···

পরদিন দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কাজে আমাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বাইরে যেতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আসছেন। দুর্গাপুরে। তারই কভারেজ। কলকাতা ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। অফিসে খবরটা লিখে-টিখে বাড়ি ফিরলুম, তখন রাত এগারোটা। কর্নেলকে ফোন করলুম।

কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন, “নাটকের শেষ দৃশ্য মিস্ করলে ডার্লিং!”

“কী ব্যাপার বলুন।”

“ব্যাপার খুব সামান্য। গতরাতে অরিজিৎকে বলেছিলুম গোবিন্দকে একটা অজুহাতে অ্যারেস্ট করতে। গোবিন্দ এখন তাই নিরাপদ। গোপালবাবু আমার ফাঁদে পা দিতে গিয়েছিলেন ডাঃ পাত্রের চেম্বারে। পুলিশ আড়ালে তৈরি ছিল। আমিও ছিলুম। গোপালচন্দ্র ঢুকেই পিস্তল বের করেছিল। এক সেকেণ্ড দেরি হলে ডাঃ পাত্রের অবস্থা হতো সেই বয়স্ক অভিনেতা নারাণবাবুর মতো।’

‘ওঁর পরিচয় পাওয়া গেছে?”

“হ্যাঁ। যাত্রায় অভিনয় করতেন ভদ্রলোক। বিজ্ঞাপন দেখে ফটো পাঠিয়েছিলেন।”

“গোপালবাবু এখন কোথায়?

“পুলিশের হাজতে। গোবিন্দ সাক্ষী, ডাঃ পাত্রও সাক্ষী! কাজেই—”

টেলিফোনের লাইনটা কেটে গেল। ট্রেন জার্নিতে ক্লান্ত। শুয়ে পড়া দরকার।···